আনন্দমেলা

৭মে ১৯৮০

আনন্দবাজার-প্রকাশন

লিনটাস-PIL. SH. 2-1810 BG

আনন্দমেলা

২৪ বৈশাখ ১৩৮৭ • ৭ মে ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ২ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
নানা জন্মদিনের মালা । কানাইলাল সরকার ৪

গল্প
অলৌকিক চাকতি-রহস্য । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১০
সুমনের কথা রাখা । শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
লক্ষ্মী ছেলে । সমর মিত্র ৪১
নতুন রাজা । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫

উপন্যাস
কে । বিমল মিত্র ১৫
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭

আত্মকথা
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ২৭

ছড়া
মাধবপুরে । প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ২৬
ফক্কুড়ি । সরল দে ৪৮

লেখাপড়া
ভাষার খেলা । কুম্ভক ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

খেলাধুলো
ইস্টবেঙ্গলের শক্ত ঘাঁটি । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫০
তিন প্রধানের তিন প্রধান । অশোক দাশগুপ্ত ৫৩
হকির হাল । চিরঞ্জীব ৫৫
সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ । মুকুল দত্ত ৫৭
দিল্লি আবার রণজি জিতল । অলোক দাশগুপ্ত ৫৮

অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৪৩
আঁকো-শেখো ৬৬

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯

প্রচ্ছদ বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাসবদত্তা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

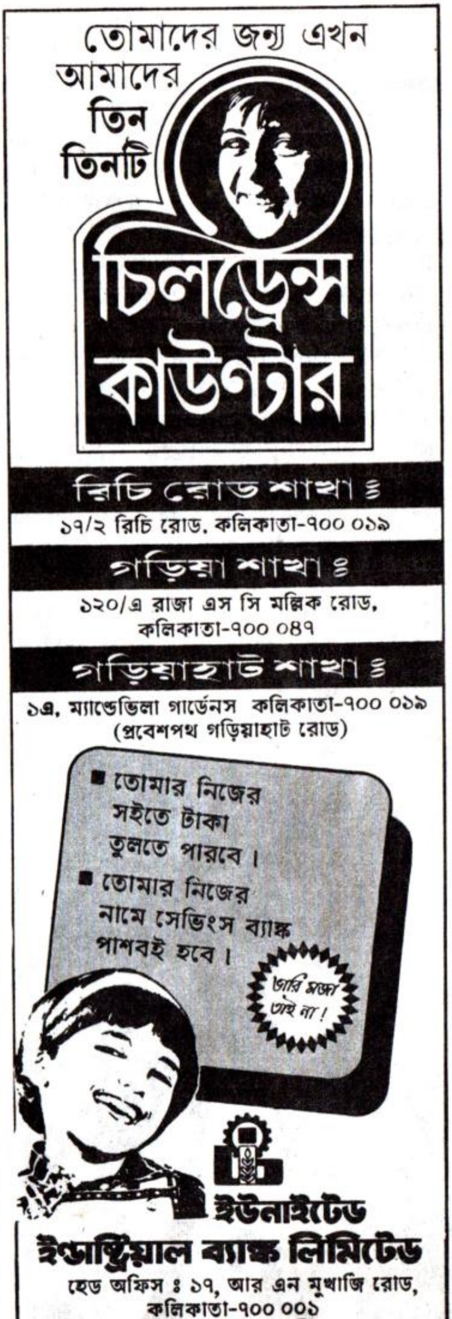

Progressive—UIB74/80

নানা জন্মদিনের মালা

কানাইলাল সরকার

তোমরা যখন এই লেখা পড়বে তখন সারা দেশে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের জোয়ার চলছে। আজকাল তো কবির জন্মদিনটিতেই শুধু জয়ন্তী পালন করা হয় না, পঁচিশে বৈশাখ থেকে শুরু করে উৎসব চলে পনেরো দিন, এমন-কী এক মাস পর্যন্ত। কবির জন্মদিনকে উপলক্ষ করে এইসব উৎসবে তোমরা অনেকেই যোগ দাও—কেউ তাঁর কবিতা আবৃত্তি কর, কেউ অভিনয় কর তাঁর নাটক, কেউ-বা গাও তাঁর লেখা গান। ছেলেবেলায় আমরা যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলুম তখন সেখানে কিন্তু এমন দীর্ঘদিনব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের কথা কেউ ভাবতেও পারত না। এমন-কী পঁচিশে বৈশাখ পর্যন্তও আমাদের অপেক্ষা করার জো ছিল না। আমরা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নতুন বছরের প্রথম দিনটিতেই কবির জন্মদিন পালন করতুম। তোমরা ভাবছ, এ আবার

সাঁওতাল দম্পতি। শিল্পী : রামকিঙ্কর

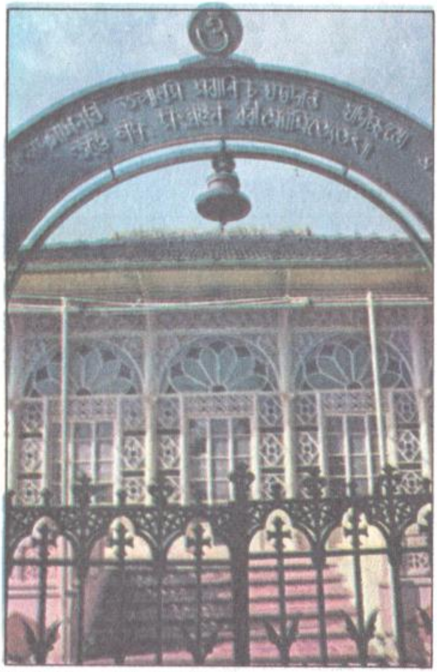

উপাসনা-গৃহ (কাচ-মন্দির)

কেমন ধারা! জন্মদিনের পঁচিশ দিন আগেই জন্মদিন পালন! এ যে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখার মতো! হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনে সেটাই রেওয়াজ ছিল। তার কারণ কী জানো? তখনকার শান্তিনিকেতন আজকের মতো এমন ছায়া-সুনিবিড় অথচ আধুনিক শান্তিনিকেতন ছিল না। এখন যেমন অনেক গাছগাছালির ছায়া আছে, আলো-পাখাওয়ালা পাকাবাড়ি আছে, দীর্ঘ দগ্ধ দিনের পিপাসা মেটাতে গভীর নলকূপ আছে, তখন তেমন ছিল না। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকেই শান্তিনিকেতনের মাঠ-প্রান্তর প্রচণ্ড এক দাবদাহে ধু-ধু করত। গাছপালা বলতে ছিল শাল, তাল, খেজুর আর নিম। যেদিকে চোখ যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধু খোয়াই আর খোয়াই। এই সময় শান্তিনিকেতনে জলকষ্ট দেখা দিত। তখন ভরসা ছিল গুটি-কয় কুয়ো। কখনো কখনো দেখেছি, আরো গরমের সময় যাতে পানীয় জলে টান না পড়ে সেই ভেবে কুয়োর জল দুর্দিনের জন্য মজুত রেখে উঁচু ক্লাসের ছাত্র এবং শিক্ষকরা অদূরের কোপাই নদী

থেকে স্নান সেরে আসতেন।

গ্রীষ্মের আগেই যেখানে এই অবস্থা সেখানে কি পঁচিশে বৈশাখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে! তাই বর্ষবরণের সঙ্গে সঙ্গে কবির জন্মদিনটাও আগাম পালন করে ফেলতুম আমরা। পরদিন থেকেই গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে যেত।

আমাদের সময় শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের জীবনযাপন ও বিদ্যাচর্চা ছিল সহজ সরল। আজ যাকে তোমরা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে জানো তখন কিন্তু তার নাম ছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। তখন শান্তিনিকেতনের বেশির ভাগ ছাত্র ছিল পূর্ববঙ্গের এবং যে-সব অভিভাবক বদলির চাকরি করতেন তাঁদের ছেলেরা। তাছাড়া গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের কিছুসংখ্যক ছাত্রও আসতেন। আর ছিল দুরন্ত কিছু বিচ্ছু ছেলে। আমার বাবা বদলির চাকরি করতেন বলে আমরা তিন ভাই-ই শান্তিনিকেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলুম। ১৯১৮ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে আমি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ভরতি হই। তখন ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের তিনটে শাখায় ভাগ করা হত—আদ্য, মধ্য ও

নববর্ষের জন্মোৎসবে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা কবি
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ সংগ্রহের ছবি

উদয়ন-বাড়ি

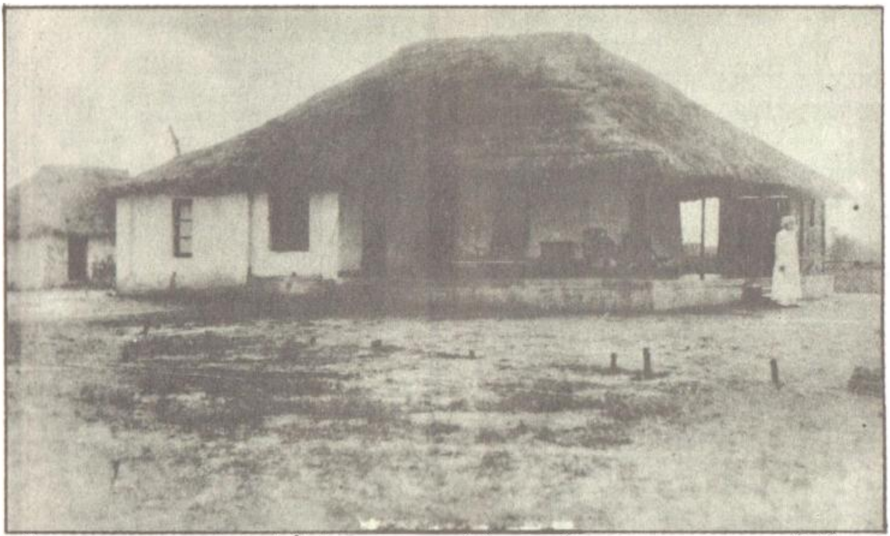

ছাতিমতলা-সংলগ্ন খড়ের ঘর 'প্রান্তিক'। গুরুদেব দীর্ঘকাল এই গৃহে থেকেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ সংগ্রহের ছবি

শিশু-বিভাগ। শিশু-বিভাগে ভরতির বয়স-সীমা ছিল সাত থেকে দশ। সুতরাং ওই কনিষ্ঠ বিভাগে ভরতির ছাড়পত্র আমি সবে পেয়েছিলুম। মধ্য-বিভাগে ভরতির বয়স ছিল দশ থেকে তেরো, আদ্য-বিভাগে তেরো থেকে ষোলো।

আমাদের দিন কেটেছে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের চালাঘরে। তখনকার শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবাসই বলো, আর গুরুপল্লীই বলো, বেশির ভাগ বাড়ির দেওয়াল ছিল মাটির, মাথার উপর খড় বা টালির ছাউনি। এককেকটি ঘরে আমরা ষোলো থেকে কুড়িজন আবাসিক ছাত্র থাকতুম। এক-একজন করে তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক-অভিভাবকও থাকতেন আমাদের সঙ্গে। আশ্রমের ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র অন্ধকার থাকতেই আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হত। ঘুম থেকে উঠে বিছানাপত্র গুটিয়ে পালা করে ঘর ঝাঁট দিতে হত আমাদের। তারপর ব্যায়াম। ব্যায়ামের পরে স্নান। কী শীত কী বর্ষা—অসুস্থ না হলে সকালে স্নানটা ছিল আবশ্যিক। স্নানের পর উপাসনা, উপাসনার পর জলযোগ, তারপর বৈতালিক, তারপর ক্লাস, তারপর আরো কত কী! প্রতিদিনের কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই সে-কথা থাক। আমাদের সেই আশ্রমিক ছাত্রজীবনে আধুনিক জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধে ছিল না, ছিল না আত্মীয়-স্বজনের নিবিড় সান্নিধ্য, তবুও মনে হত আমরা যেন এক আশ্চর্য আনন্দের রাজ্যে বাস করছি যেখানে গুরুদের স্নেহ, গুরুপত্নীদের মমতা সব রকমের আপদ-বালাই থেকে আমাদের রক্ষা করে।

এবারে সেই পয়লা বৈশাখের উৎসব প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

উৎসবের দিনে আশ্রমের কর্মসূচী ছিল অন্যরকম। পয়লা বৈশাখের আগের দিন বর্ষশেষের সন্ধ্যা থেকেই জন্মোৎসবের আয়োজন চলত। শান্তিনিকেতনে মন্দির হত সাধারণত উষাকালে। গুরুদেব নিজেই উপাসনার বেদিতে বসতেন। কিন্তু বর্ষশেষের মন্দির হত সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায়। এই প্রসঙ্গে বলি, মন্দির যে কাচের হয় আগে তা জানা ছিল না আমাদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাইরের আলো যেন মন্দিরে প্রবেশে বাধা না পায়। শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামবাসীদের মুখে শান্তিনিকেতনের আর-এক নাম তাই কাচ-বাংলা।

বর্ষশেষের মন্দিরের গান প্রধানত বর্ষবিদায় আর নতুন বছর আবাহনের উদ্দেশ্যে গাওয়া হত। মনে আছে,

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বর্ষশেষের উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন বছরে যোগ দিয়েছেন, আচার্যের পদ গ্রহণ করে উপাসনা পরিচালনা করেছেন।

পয়লা বৈশাখ সকালে আলো-ফোটার আগেই বৈতালিকের গান সমস্ত আশ্রম-বাসীর ঘুম ভাঙিয়ে দিত। বৈতালিকের একটি গানের কথা মনে পড়ে—'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে—'। তারপর সবাই মিলিত হতেন মন্দিরে। মন্দিরের ঘণ্টা প্রায়ই নিজের হাতে বাজাতেন কবি। একে একে সবাই জড়ো হতেন সেখানে। সমবেত সংগীত গেয়ে মন্দিরের কার্যক্রম শুরু হত। এই গান পরিচালনা করতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভীমরাও শাস্ত্রী। উপাসনার অন্যতম অঙ্গ ছিল স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায় কী জানো? সুললিত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে কবি সেটি সহজ বাংলায় এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যাতে শিশুরাও সে-ব্যাখ্যা বুঝতে পারে। মন্দির থেকে কবি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতেন তখন তাঁকে মনে হত এক আর্য ঋষি। কপালে শ্বেতচন্দন, গলায় বেলফুলের গোড়ে-মালা। অন্য সময় কবিকে জোব্বা, জাপানি কিমোনো, ধুতি-পাঞ্জাবি—সব রকম পোশাকেই দেখেছি, কিন্তু পয়লা বৈশাখে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরেননি এমনটি দেখিনি। মন্দির-শেষে তিনি যখন বাইরে আসতেন তখন আশ্রমবাসীরা তাঁর পদধূলি নিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করতেন।

তারপর সবাই বকুলতলায় সমবেত হতুম। কোনো ধরাবাঁধা বসার আয়োজন ছাড়াই প্রশস্ত জায়গায় জলযোগের ব্যবস্থা হত। সবাই সারবন্দী হয়ে মাটিতে বসে যেতেন। পরিবেশন করা হত শালপাতায়। জলযোগের তালিকায় থাকত তরমুজ, ফুটি, কলা, আখ, শসা, মুগ-ভিজের সঙ্গে এখো গুড়, এক গেলাস ঘোলের বা আমপোড়া শরবত আর আশ্রমে তৈরি দুটি করে পান্তুয়া দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই পঙ্ক্তিভোজন শুধু আশ্রমবাসীদের জন্যেই নয়, অবারিত ছিল আশপাশের গ্রামের সাঁওতাল ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর জন্যেও।

শালবীথির সামনে সেকালের ঘন্টাতলা

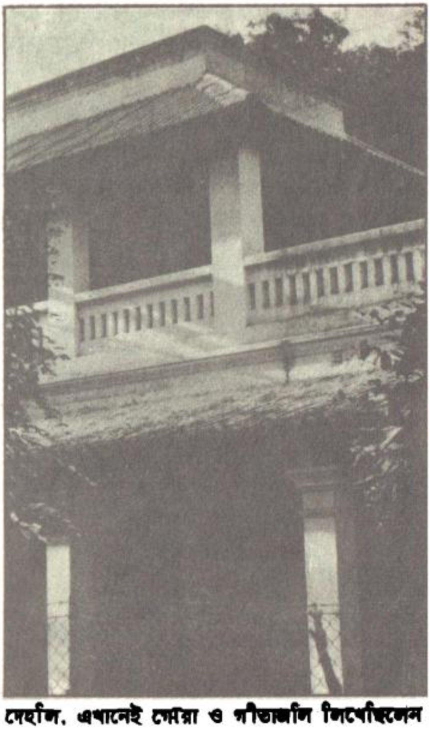
দেহলি, এখানেই খেয়া ও গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন

পরিবেশনে অংশ নিতে পেরে আমরা গর্ববোধ করতুম। নিজের জন্মোৎসবে কবি সব সময়ই মিষ্টিমুখের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলকাতায় যে-জন্মোৎসব হয়েছিল সেখানে আমরা তাঁকে পেয়েছিলুম। অনুষ্ঠানে সেদিন আইসক্রীম পরিবেশন করা হয়েছিল। তারিয়ে-তারিয়ে সেই আইসক্রীম খেয়ে গুরুদেব সেদিন বলেছিলেন, শুধু গান-আবৃত্তি-বক্তৃতায় জন্মোৎসব সার্থক হয় না, সঙ্গে একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

বকুলতলার অনুষ্ঠানের পর শুরু হত আম্রকুঞ্জের জন্মোৎসব। মেয়েরা আগের দিন এখানে আলপনা এঁকে রাখতেন। আলপনার নকশা করে দিতেন কখনো নন্দলাল বসু, কখনো সুরেন কর। থাকত পলাশ ফুল আর শালের মঞ্জরী। গাছে গাছে অসংখ্য আমের পল্লব উৎসব-অঙ্গনে চন্দ্রাতপ খাটিয়ে রাখত। সেই ঝিলমিলি-চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে রোদ্দুরও যেন ঝিকিমিকি আলোর আলপনা আঁকত। আম্রকুঞ্জের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল গান, আবৃত্তি এবং গুরুদেবের ভাষণ।

এর পর নাট্যগৃহে সান্ধ্য অনুষ্ঠান। সারা দুপুর ধরে দেবদারু, খেজুরপাতা, পলাশ, আকন্দ, কাঠগোলাপ ইত্যাদি ফুলপাতায় নাট্যগৃহ সাজানো হত। আমরা যারা গানের দলে ঠাঁই পেতুম না তাদেরও এই কাজে উৎসাহ কিছু কম ছিল না। পদ্মফুল পাওয়া যেত সুদূর সুপুর রায়পুর গ্রামে। ঠা-ঠা রোদ্দুরে দল বেঁধে সেখানে গিয়ে আমরা পদ্মফুল আর পদ্মপাতা এনে সভা সাজিয়েছি।

কবি প্রতি বছরের জন্মোৎসবের জন্য নতুন গান বাঁধতেন, সেই গান গাওয়া হত। অভিনীত হত তাঁর লেখা নাটক। সে-যুগে বিসর্জনের একটি বিশেষ নাট্যরূপ অভিনয় করা হত যাতে গুণবতী বা অপর্ণার কোনো ভূমিকা থাকত না। গানের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরের যুগে অনেকেই নাম করেছেন। কিন্তু সমরেশ সিংহ ও প্রসূন সেনের (ডাকনাম বুনি) নাম কি তোমরা শুনেছ? এই দুই আশ্রম-বালক গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয় গায়ক ছিলেন। বুনি বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম দস্যুর অভিনয় করতেন। ফাল্গুনী নাটকের প্রথম অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল 'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া' গানটি

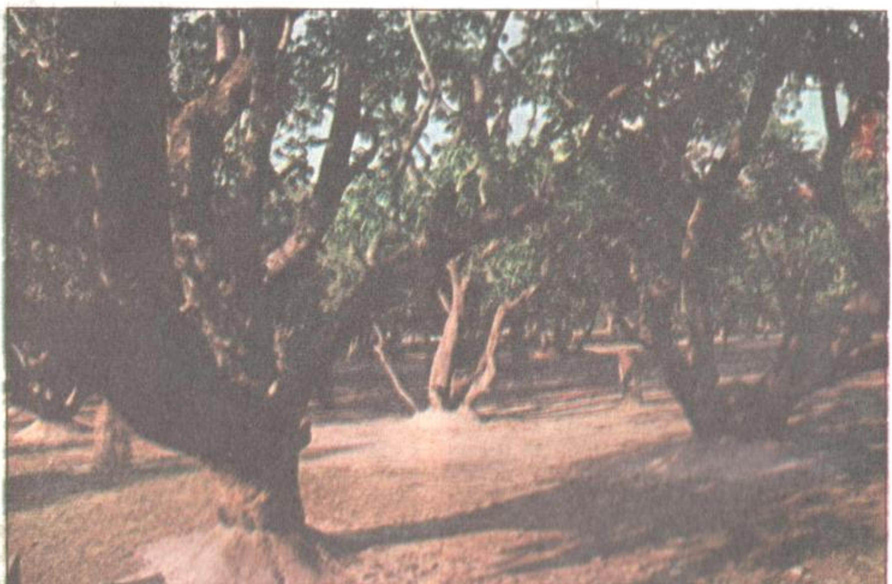

বহু উৎসবের সাক্ষী এই আম্রকুঞ্জ

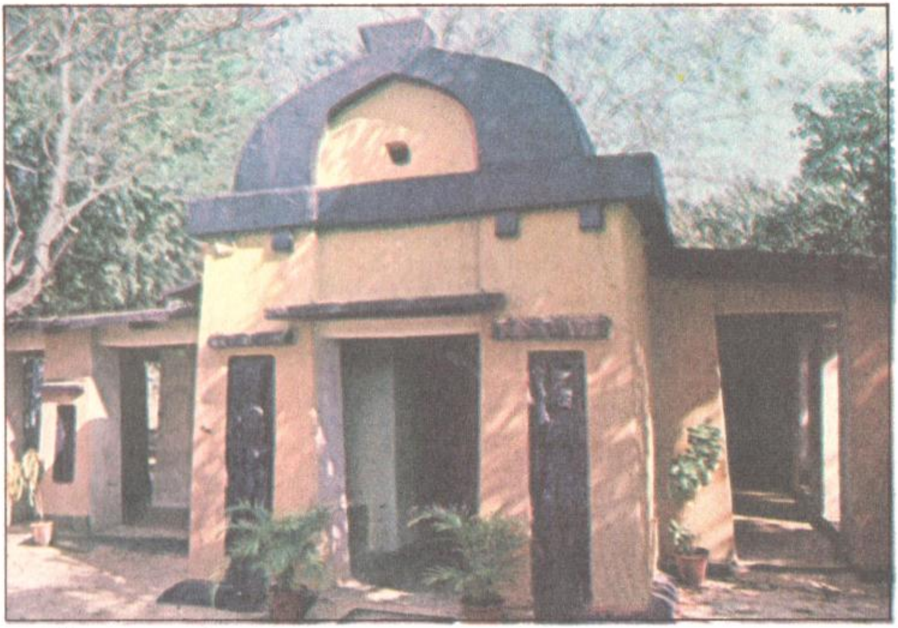

শ্যামলী

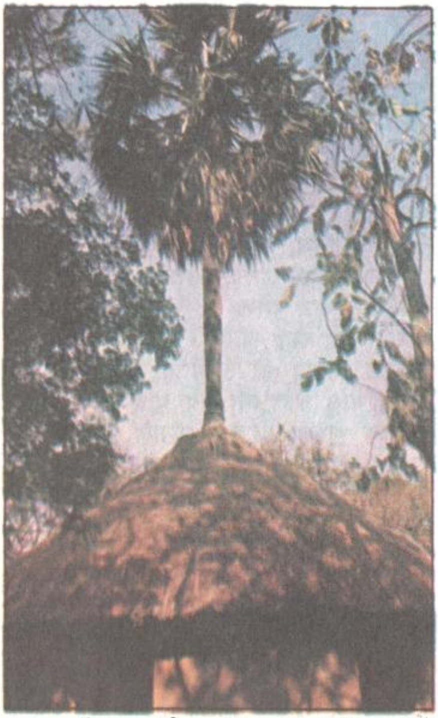

তালধ্বজ (আমাদের শিক্ষক তেজেশচন্দ্র এইভাবে তাঁর বাড়িটিকে গড়ে নিয়েছিলেন)

দিয়ে। গেয়েছিলেন সমরেশ সিংহ।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পর রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বৈতালিকের দল 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানটি গেয়ে আশ্রম পরিক্রমণ করত; আমরা সারাদিনের উৎসাহ-উদ্দীপনার পর বিছানায় শুয়ে আধো-ঘুমের মধ্যে শুনতুম, 'আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব—'। সুর মিলিয়ে যেত দূরে, বুঝতে পারতুম বৈতালিকদল শালবীথি ছাড়িয়ে দেবদারু শ্রেণীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

গুরুদেব বেঁচে থাকতে শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। ওই পয়লা বৈশাখেই। উদয়ন-বাড়ির সেই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি জন্মদিনের শেষ গানটি লিখেছিলেন—'ওই মহামানব আসে'। আর এই উপলক্ষে 'সভ্যতার সংকট' নামে তাঁর লিখিত ভাষণটি তাঁর পাশে বসে পাঠ করেছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। বড় হয়ে এই লেখা আর গানের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করলে তোমরা বুঝবে কোন্ সংকটের কথা তিনি বলেছেন, আর প্রতীক্ষাই বা করেছেন কোন্ মহামানবের।

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

অলৌকিক চাকতি-রহস্য

আমার ভাগনে ডন সেদিন ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, "মামা! মামা! আলাদিন!"

"আলাদিন মানে?" অবাক হয়ে তাকালুম ওর দিকে। ডনের চোখেমুখে রহস্য ঝিলিক দিচ্ছে। ঠোঁটের কোনায় কেমন একটা হাসি। একটু একটু হাঁফাচ্ছে। মনে হল, খুব দৌড়ে এসেছে শ্রীমান।

ডন বলল, "আলাদিন মানে ম্যাজিক ল্যাম্প। পেয়ে গেছি মামা।"

হাসতে হাসতে বললুম, "বেশ তো, এবার ওটা ঘষে দ্যাখ, দৈত্যদানা বেরোয় নাকি।"

ডন হাতের মুঠো খুলে আমার দিকে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ?"

ওর হাতের চেটোয় একটা ছোট্ট চাকতি। আগে যেমন তামার পয়সা ছিল, তেমনি দেখতে। শ্যাওলা রঙের জং ধরে আছে। দেখে নিয়ে বললুম, "হ্যাঁ রে, তবে যে বললি আলাদিনের ম্যাজিক ল্যাম্প! এ তো দেখছি একটা চাকতি! এটা ঘষে কি দৈত্য বেরোবে? বড়জোর কষ্টেসৃষ্টে একটি টিকটিকি বেরুতে পারে।"

ডন গম্ভীর হয়ে বলল, "না মামা। এটা আলাদিনের নাম্বার টু। এর ম্যাজিক একেবারে অন্যরকম।"

"কীরকম, শুনি?"

ডন ঝটপট এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "খুব সিক্রেট ব্যাপার, মামা। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে। এই চাকতিটা যদি ভালুককে খাইয়ে দাও, ভালুকটা গাধা হয়ে যাবে। আবার গাধাকে খাইয়ে দিলে গাধাটা ভালুক হয়ে যাবে। দারুণ ম্যাজিক, তাই না?"

মুখটা ওর মতো গম্ভীর করে বললুম, "তাই বুঝি? তুই নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখেছিস?"

ডন আনমনে বলল, "এখনও দেখিনি। সেজন্যেই তো তোমার কাছে এলুম। একা টেস্ট করতে সাহস পাচ্ছি না, মামা।"

ওকে সাহস দিয়ে বললুম, "ভাবিস নে। আমি তোর সঙ্গে আছি। তবে তার আগে গোড়ার কথাটা বল তো বাবা, এ চাকতি তুই

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পেলি কোথায়? আর এটার অমন ম্যাজিকের কথাই বা জানলি কীভাবে?''

ডন এতক্ষণে শান্ত হয়ে বসল। তারপর চাকতিরহস্য ফাঁস করল। চাকতিটা তাকে দিয়েছে বুধিরাম ভালুকওয়ালা। বুধিরামকে আমি কখনও দেখিনি। তার ভালুকটাও দেখিনি। তবে এই ছোট্ট শহরে মাঝে মাঝে ভালুকওয়ালারা ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে ভালুকের নাচ দেখাতে আসে। কুকুরগুলো তাতে বেজায় রেগে যায়। ভালুকওয়ালা পাড়া ছেড়ে গেলেও পাড়ার কুকুরদের রাগ কতক্ষণ পড়ে না। তাদের গজরানি শুনে টের পাই, হুঁ—ভালুকের নাচের আসর বসেছিল পাড়ায়।

তো বুধিরাম ডনকে দু টাকায় চাকতিটা বেচে গেছে। এই অলৌকিক চাকতি বুধিরাম পেয়েছিল হরিদ্বারে এক সাধুর কাছে। ঝড়-জলের রাতে বনের ভেতর ভালুকের বাচ্চা ধরতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল বুধিরাম। অনেক কষ্টে একটা পাহাড়ি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে ছিলেন সেই সাধু। কিন্তু তিনি অসুস্থ। বুধিরাম তাঁর সেবাযত্ন করেছিল। তবু বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর আগে সাধুবাবা তাকে চাকতিটা দিয়েছিলেন।

বুধিরাম চাকতিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। বাচ্চা ভালুকটাকে নাচ আর হরেকরকম খেলা শিখিয়ে বড় করেছিল। এর পর একদিন নদীর ধারে শীতের রোদে বসে বুধিরাম ছাতু খাচ্ছে। তার ভালুকটা পাশে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। হঠাৎ হল কি, ভালুকটা বুধিরামের ঝোলার কোণটা চিবুতে শুরু করল। প্রথমে বুধিরাম অতটা লক্ষ করেনি। তারপর দেখল, ভালুকটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। সটান দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আচমকা অবিকল গাধার মতো একখানা ডাক ছাড়ল। বুধিরাম হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে ভালুকের কালো চেহারা সাদা হয়ে যাচ্ছে। গড়নও বদলাচ্ছে।

তারপর ফের একবার ডাক ছাড়তেই তাজ্জব বুধিরাম দেখল, তার সাধের ভালুক স্রেফ গাধা হয়ে গেছে এবং গলায় বকলেস ও শেকলসমেত চারঠ্যাঙে নড়বড় করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ছাতু খাওয়া ফেলে বুধিরাম চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ল। ''আরে উল্লুক।

"নিখুঁত পরিষ্কার"

আমি সাবান চাইতেই দোকানদার দিল হুইল—বলল, "এর দাম সাবানের চেয়ে বেশী নয়।"

কাপড়ের ময়লা এমন চমৎকারভাবে ধুয়ে বেরোয় দেখে আমি তো অবাক! চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না—হুইল-এ, কী দারুণ ফেনা হয়!

হুইল, সাবানের চেয়ে কত বেশী কাপড় ধোয়··· তাও নিখুঁত পরিষ্কার ক'রে। সাবান তো শুধু পুরোনপন্থীদের জন্যেই···

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি—চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.10-1810 BG

করছিস কী। তুই গাধা নাকি? তুই তো ভালুক আছিস।''

ভালুক বা গাধা কানে নিল না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে ওপাশের মাঠে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণে বুধিরাম টের পেল কী হয়েছে। ওর ঝুলির তলার নানান টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে সাধুবাবার চাকতিটাও রেখে দিয়েছিল। হাঁদারাম ভালুক ঝুলির কোণসুদ্ধ চাকতিটা গিলে ফেলেই এই গন্ডগোল!

বুধিরামের তখন মহা সমস্যা। শিক্ষিত ভালুক হাতছাড়া হলে রোজগার বন্ধ। সে দৌড়ল। মাঠে গিয়ে দেখল, তার নির্বোধ জানোয়ারটা গিয়ে পড়েছে এক ধোপার পাল্লায়। ধোপার নাম রামু। রামু ঝিলের ধারে কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছিল। সবে জড়ো করে প্রকান্ড বোঁচকা বেঁধেছে, এমন সময় গাধাটা পেয়ে তার সুবিধেই হল।

আসলে হয়েছে কি, রামুর একটা গাধা ছিল। গাধাটা কদিন আগে হারিয়ে গেছে। এই গাধাটা দেখে রামু ভেবেছে, তারই সেই হারানো গাধার সুবুদ্ধি হয়েছে এবং মনিবের কাছে ফিরে এসেছে। গলায় বকলেস আর শেকল দেখে রামু দুঃখ করে বলল, "আহা! কোন বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলি বাবা? দেখ দিকি, গলায় বকলেস আর শেকল পরিয়ে বেঁধে রেখেছিল! চল, চল। বাড়ি গিয়ে খুলে দোব'খন।''

বোকা জানোয়ারটা দিব্যি রামুর প্রকান্ড বোঁচকা পিঠে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এতটুকু আপত্তি করছে না দেখে বুধিরামের চোখে জল এসে গেল রাগে আর দুঃখে। মনে মনে বলল, 'বটে রে নেমকহারাম!' তারপর সোজা এগিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "অ্যাই বেটাচ্ছেলে! তুই গাধা, না ভালুক? ফেলে দে বোঁচকা। ফেলে দে বলছি।''

ব্যস, রামুর সঙ্গে বুধিরামের ঝগড়া বেধে গেল। রামু বলে, "এ আমার গাধা!" বুধিরাম বলে, "কক্ষনো না, এ আমার ভালুক!" গন্ড-গোল শুনে ভিড় জমে গেল। ঝগড়াঝাটিতে ভিড় জমলে যা হয়, একদল রামুর পক্ষে, আরেকদল বুধিরামের পক্ষে। তার ফলে মারামারি বেধে যায় আর কি! খবর পেয়ে থানা থেকে দারোগাবাবু এক দঙ্গল সেপাই নিয়ে হাজির। দারোগাবাবু সব শুনে এক কথায় মীমাংসা করে দিলেন। "বেশ! সাধুর চাকতি খেয়েই যদি বুধিরামের ভালুক রামুর গাধা হয়ে থাকে, তাহলে চাকতিটা ওর পেটেই আছে। পেট চিরে দেখলেই বোঝা যাবে।''

এতে কিন্তু রামুর যত, তত বুধিরামেরও আপত্তি। জানোয়ারটা মারা পড়বে যে! শেষে রামুই একটা ফিকির বাতলে দিল। নাদি হাতড়ে দেখবে, চাকতি আছে নাকি। থাকলে আলবাত যার জানোয়ার তাকে ফেরত দেবে। বুধিরাম অগত্যা রাজি হল।

সাধুর চাকতি যাবে কোথায়? পরদিনই গাধার আস্তাবলে পাওয়া গেল। তখন রামু বুধিরামকে বলল, "ভাই বুধিরাম! গাধাটা দিলে আমি কষ্টে পড়ব। তার চেয়ে বরং তুমি কিছু টাকা নাও। ভালুক তো তুমি জঙ্গল ঢুঁড়লে পেয়ে যাবে বিনি পয়সায়। গাধা তো বিনি পয়সায় জঙ্গলে পাব না।"

বুধিরাম ভেবে দেখল, মন্দ হবে না। সে টাকা নিয়ে চলে এল। রামু-ধোপার বাড়িতে সেই আজগুবি ভালুক বা গাধা, কিংবা গাধা বা ভালুক যাই হোক, বহাল তবিয়তে আছে। কাপড়ের বোঁচকা বইছে। মন ভাল থাকলে গানও গাইছে গলা ছেড়ে। বুধিরাম ফের একটা ভালুক যোগাড় করেছে জঙ্গল ঢুঁড়ে। তবে এখনও পোষ মানেনি তত। মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। খুঁজে নিয়ে আসে বুধিরাম।...

অলৌকিক চাকতির গুপ্তরহস্য ফাঁস করে শ্রীমান ডন বলল, "চাকতিটা পেয়ে একটা কথা ভাবছি, মামা। যা খেয়ে ভালুক গাধা হয়ে যায়, তা খেয়ে গাধাই বা ভালুক হবে না কেন?''

সায় দিয়ে বললুম, "ঠিক বলেছ। তাই তো হওয়া উচিত।''

ডন ফিসফিস করে বলল, "কাকেও বোলো না মামা। রোজ বিকেলে দেখি, ঝিলের ধারে ধোপাদের গাধা চরে বেড়ায়। খাইয়ে দেব চাকতিটা। কিন্তু একা যে পারব না। তোমার হেল্প্ চাই মামা!''

মনে মনে আঁতকে উঠে বললুম, "বেশ তো। আগে তুমি একা চেষ্টা করে দেখ। না পারলে আমি তো আছি!''

ডন উৎসাহে প্রায় নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল। বুঝলুম, বেচারা গাধাদের বরাতে কিংবা উলটে ডনের বরাতেই কিছু একটা

আছে। গাধাকে চাকতি গেলানো কি সহজ কথা?

বিকেলে দূর থেকে দেখলুম, শ্রীমান ডন মাঠে ওত পেতে আছে। একটা গাধা আনমনে চরছে। একটু পরে ডন কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হুঁ, বুদ্ধি আছে শ্রীমানের। এক-গোছা ঘাসের ভেতর চাকতিটা গুঁজে গাধাটার মুখের সামনে ধরল। অবাক হয়ে দেখলুম, গাধাটা দিব্যি ঘাসের গোছা মুখে পুরে দিল। এবার আমার গা শিউরে উঠল। সত্যিই কি কিছু ঘটবে? সেকেন্ডগুলো লম্বা মনে হচ্ছিল। মিনিটগুলো কাটতে চায় না। গাধাটা আকাশের দিকে আচমকা একটা ধাজখাঁই হাঁক ছাড়ল। তারপর ওপাশের জঙ্গলের দিকে দৌড়ুল। চোখে কি ভুল দেখছি? গাধাটার গায়ের রঙ যেন বদলে ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য সূর্য ডুবে গেছে। রোদ আর নেই। ছাইরঙা আলোয় গাধার গায়ের রং ধূসর দেখানোও স্বাভাবিক। তাতে বেশ খানিকটা দূরে আছি। ডনকে দেখলুম। পা টিপে-টিপে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর আর কাকেও দেখতে পেলুম না। না গাধা না ডন।

মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ ডন প্রায় ডিগবাজি খেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এবং দিশেহারা হয়ে দৌড়ুতে থাকল। চেঁচিয়ে ডাকলুম, "ডন! ডন! কী হয়েছে?"

আমাকে দেখে ডন দৌড়ে কাছে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "গাধা মামা, গাধা! ভালুক হয়ে গেছে!"

শিউরে উঠে বললুম, "বলিস কী! চল তো দেখি।"

ঝিলের ধারে জঙ্গলটার ভেতর কতকালের একটা ভাঙা মন্দির আছে। তখনও আলো মরেনি। ডনের ইশারা-মতো উঁকি মেরে দেখি, মন্দিরের চত্বরে সত্যি একটা কালো ভালুক সামনের দু ঠ্যাঙ খাড়া করে বসে আছে। কী হিংস্র চেহারা!

তা তো হবেই। চাকতির ম্যাজিক। ফিস-ফিস করে বললুম, "এখন আর কিছু করার নেই। কাল সকালে বরং ভালুকটার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। হিড়িক ফেলে দেব আমরা। পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যাবে দেখবি।"

ডন খুশি হয়ে বলল, "আমরা নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব, কী বলো মামা?"

"তা আর বলতে?" বলে আমরা মাঠে ফিরে এলুম। সেই সময় দেখি, হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ব্যস্তভাবে একটা লোক আসছে। তার কাঁধে ঝুলি। অন্য হাতে একটা ডুগ-ডুগি। আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম।

লোকটা সেলাম দিয়ে বলল, "বাবুজি! এদিকে একটা ভালুক দেখেছেন? আমার ভালুকটা পালিয়ে এসেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ডন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বুধিরাম, বুধিরাম! ওখানে একটা ভালুক আছে কিন্তু। খবর্দার, ওটা তোমার ভালুকটা ভেবে বোসো না বলে দিচ্ছি।"

"জরুর" বলে মুচকি হেসে বুধিরাম দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকল। আমি গম্ভীর হয়ে ডনের হাত ধরে বললুম, "বাড়ি আয় ডন!" এই সময় আবছা আঁধারে কোথাও একটা গাধা ডেকে উঠল। সাধুর চাকতি গলায় আটকে যায়নি তো গাধাটার? ডনটা বড্ড বাজে ঝামেলা করে।

আগেকার দিনে তো আবহাওয়া অফিস ছিল না, যন্ত্রপাতিও ছিল না। বাড়ির বাইরে মাঠে-ঘাটে যারা কাজ করত তারা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারত বৃষ্টি আসছে। তারা দেখত, সূর্যমুখী ফুল মাথাটা একটু উঁচু করেছে আর সব ফুলেরই গন্ধ একটু যেন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, দেখত ভেড়াগুলো একটু যেন বেশি ছুটোছুটি লাফালাফি করছে, ঘোড়া আর গোরুমোষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। পাখিরা ঠোঁট দিয়ে পালক ঘষছে আর বড্ড কিচিরমিচির করছে; তার মানে বৃষ্টি এল বলে। তারা আরও জানত, যখনই দেখবে মাকড়সারা জালগুলোকে মজবুত করছে, বুঝবে বৃষ্টি আসছে। আর যদি দেখ, মৌমাছিরা [illegible] কাছেই উড়ছে, দূরে যাচ্ছে না, জানবে বৃষ্টির আর দেরি নেই। কেননা হঠাৎ জল [illegible] পড়লে বাসা থেকে দূরে কোথাও আটকে পড়তে মৌমাছিরা মোটেই রাজি নয়।

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতিকে চন্দ্রভানু চুরি করেছেন। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিসের-হাতে-আটক বেহুঁশ একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দৌলির ধনী বাসিন্দা চৌবেজির ঘরে ঠাই পায়। সূর্যনারায়ণ তাকে 'দেবদত্ত' বলে ডাকেন। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু। কিন্তু দেবদত্ত বা দেবু যে জয়রামেরই ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেছেন। চন্দ্রভানুর গাড়ি নিয়ে বেড়াতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। শোকার্ত জয়রাম ইতিমধ্যে সূর্যনারায়ণের বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু দেবু অর্থাৎ আসল-জ্যোতিও ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সংগ নিয়ে ঘর ছেড়েছে। তারপর....

॥ ১১ ॥

হয়তো গাড়িতে আবার কোনও স্টেশনে টিকিট-চেকার উঠবে। আবার সে তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে। কিন্তু তাতেও সাধুবাবার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনটাই নাকি এই রকম। একবার ওঠে, আর একবার নামে। আমরা সবাই যাত্রী, উঠতে-উঠতে নামতে-নামতেই আমরা নাকি যে-যার জায়গায় পেঁাছে যাব। আমাদের জীবনের নাকি এই ই নিয়ম।

কামরার ভেতরে যে যেমন ভাবে পেরেছে ঘুমোচ্ছে। কেউ বসে বসেই ঢুলছে, কেউ দুই হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। কেউ বেঞ্চিতে বসবার জায়গা পায়নি, কামরার মেঝের ওপরই ধুলোর ওপর অজ্ঞান হয়ে মড়ার মতন পড়ে রয়েছে। কোথাও পা ফেলবারও জায়গা নেই।

ট্রেন চলতে লাগল।

সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলে, "কী রে, ঘুম পাচ্ছে?"

দেবু বললে, "হ্যাঁ, খুব ঘুম পাচ্ছে।"

"তাহলে আমার সংগে এলি কেন? বাড়িতে থাকলে আরাম করে ঘুমোতে পারতিস।"

দেবু বললে, "আমার তো আসল বাড়ি নয় ওটা।"

সাধুবাবা বললে, "কারোরই কোনও বাড়িটা আসল বাড়ি নয়। যে যে-বাড়িতে জন্মেছে সেটাও তার আসল বাড়ি নয়। অথচ সবাই সেইটেকেই তার বাড়ি বলে মনে করে। মনে করে তার ওপরে তার জন্ম-জন্মান্তরের অধিকার আছে। তাই নিয়েই লাঠা-লাঠি করে, ভাইতে ভাইতে মামলা করে, তারপর একদিন মরে যায়। তখন বাড়ি-ঘর-দোর সব এখানে ফেলে রেখে তার আসল বাড়িতে পেঁাছে যায়।"

দেবু বললে, "তোমারও নিজের বাড়ি ছিল সাধুবাবা?"

সাধুবাবা বললে, "হ্যাঁ, আমারও বাড়ি ছিল, আমার বাবারও টাকা ছিল অনেক, কিন্তু এখন সেই আসল বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তার মানে? আসল বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছ মানে? তুমিও কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?"

সাধুবাবা বললে, "যা পেলে সবাই মনে করে সব পেয়েছি আমার তা সব-কিছুই ছিল। তবু আমার মনে হল আমি মিছিমিছি পুতুল-খেলা নিয়ে মেতে আছি। তাই সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছি। এখন এমন কিছু পেতে চাই যা পেলে সব-কিছু চাওয়া-পাওয়া মিথ্যে হয়ে যায়।"

এক ভদ্রলোক বোধহয় জেগে জেগে দুজনের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাবাজি, তোমরা কতদূর যাবে?"

সাধুবাবা বললে, "অনেক দূর।"

"তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক দূর যেতে তো তোমাদের বড় কষ্ট হবে। তোমরা এখানে এসে একটু বোসো না। আমি জায়গা করে দিচ্ছি।"

বলে ভদ্রলোক সরে গিয়ে সামান্য একটু জায়গা করে দিলেন।

সাধুবাবা বললেন, "আমরা তো টিকিট কাটিনি। আমরা বিনা টিকিটের যাত্রী।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাতে কী হয়েছে। আমরা সবাই বিনা টিকিটের যাত্রী। তোমাদের কথাগুলো শুনছিলুম, বড় ভাল লাগছিল, তাই বসতে বলছি। এই ছেলেটি কে?"

সাধুবাবা বললে, "আমি এখনও নিজেই জানি না আমি কে, তা একে আমি জানব কী করে? এ আমার পিছু নিয়েছে, এইটুকুই শুধু জানি।"

ভদ্রলোক বললেন, "বড় ভাল কথা বলেছ বাবাজি। বড় দামি কথা। আমরা কেউই কাউকে চিনি না, অথচ নিজের-নিজের অহঙ্কারে আমরা সব - কিছু জানি বলে বেড়াই। তোমার ওই গানটা শুনছিলুম আর ভাবছিলুম আমি কীসের পেছনে এতদিন দৌড়োচ্ছি।"

ততক্ষণে সাধুবাবা আর দেবু ঘেঁষাঘেঁষি করে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসেছে। ভদ্রলোক নিজের কথা বলতে লাগলেন। ভদ্রলোকের বাবা অনেক টাকা রেখে মারা গিয়েছেন। বাড়ি-জমি-জমা-পুকুর খেত-খামার অনেক কিছু। বাবা মারা যাবার আগে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। বেশ আরাম করে জীবন কাটিয়েছেন। লেখা পড়া করেছেন। মা আগেই ছিলেন না। ভাই-বোনও ছিল না। তারপর বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে যত মামলা-মকদ্দমা শুরু হয়েছে। সেই মামলা-মকদ্দমায় একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, এই দিনই কোর্ট থেকে ফিরছেন। উকিল-অ্যার্টনী আর পেশকারে মিলে তাঁকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সাধুবাবা আর দেবু দুজনেই ভদ্রলোকের গল্প শুনছিল। ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কে তা আমি জানি না। কিন্তু তোমার ওই গানটা শুনে আমার খুব ভাল লাগল। তুমি একেবারে আমার মনের কথাগুলো বলেছ বাবাজি।"

বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলাটা একেবারে করুণ হয়ে উঠল।

এতক্ষণে ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামল। ভদ্রলোক বললেন, "এখানে আমি নামব।"

সাধুবাবা বললে, "সম্পত্তি থাকলেই ঝঞ্ঝাট। আমার কিছু নেই, তাই আমার ঝঞ্ঝাটও নেই।"

ভদ্রলোক বললেন, "সেই জন্যেই তো তোমাকে হিংসে হচ্ছে বাবাজি। আমার সঙ্গে এখানে কিছুদিন থাকবে? তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

সাধুবাবা বললে, "আমি তো সন্নিসী মানুষ, আমার কোনও অবস্থাতেই অসুবিধে হয় না।"

"তাহলে এসো বাবাজি। আমার ইচ্ছে আছে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে একটা রামজি

মন্দির বানাব। তুমি যদি সেই মন্দিরের ভার নাও বাবাজি তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাব, নেবে? ভার নেবে?"

সাধুবাবা দেবুর দিকে চাইলে। বললে, "দেখলি তো রামজির কী খেলা? তুই সারাদিন কিছু খাসনি, শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপছিস। সাধ করে আমার সঙ্গে এসে সব থাকতেও কষ্ট পাচ্ছিস, বল এর সঙ্গে যাবি কি না। যাবি?"

দেবু বললে, "তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। চলো।"

ভদ্রলোক মহাখুশি, বহুদিন ধরে মামলা-মকদ্দমার জ্বালায় ভদ্রলোক জ্বলছিলেন। এবার যেন সাধুবাবাকে পেয়ে একটু মুক্তি পেলেন। ট্রেনটা থামতেই সবাই মিলে প্লাটফর্মের ওপর নামল। আবার সেই কনকনে ঠাণ্ডা। আবার সেই অনির্দিষ্ট যাত্রা। সাধুবাবা আবার সেই গানটা গাইতে লাগল, "ইস নগরিমে সভি মুসাফির, না কাহুকা ঘর হ্যায়..."

জ্যোতি যখন প্রথম এসেছিল মতিহারিতে তখন তেমন মন বসেনি তার। কেবল জিজ্ঞেস করত, "এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে! কেন নিয়ে এলে? তুমি কে?"

চন্দ্রভানুবাবুও তাকে খুব ভোলাতে চেষ্টা করতেন। সেই প্লেনের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল জ্যোতির। জ্ঞান ফিরে আসার পরই প্রথমেই চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। সে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না।"

চন্দ্রভানুবাবু বলেছিলেন, "আমি তোমার কাকাবাবু। আমাকে তুমি তোমার কাকাবাবু বলে ডাকবে।"

"কিন্তু আমি কোথায় এখন?"

"তুমি অনেক দূরে যেতে চেয়েছিলে, তাই তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কই, আমি তো অনেকদূরে যেতে চাইনি কখনো!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অনেক দূরে যেতে চেয়েছিলে! তোমার মনে পড়ছে না? সেই যে তোমাকে নিয়ে আমি ট্রেনে যাচ্ছিলুম, তারপরে ট্রেনে একটা দুর্ঘটনা হল, তোমাকে আমি বলেছিলুম আমি তোমাকে আকাশে নিয়ে যাব। কিছুই তোমার মনে পড়ছে না।"

"না।"

"মনে করতে চেষ্টা করো। তাহলে ঠিক মনে পড়বে। সেই জন্যেই তো এখন তোমাকে আকাশে নিয়ে যাচ্ছি। ওই দেখো আমরা আকাশের কত কাছাকাছি এসে গিয়েছি। জানলা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ পৃথিবী থেকে কত উঁচুতে উঠে এসেছি আমরা।"

জ্যোতি জানলা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলে। অনেক নীচের ছোট ছোট ঘরবাড়ি। যেন পুতুলের সংসার।

তারপর সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে চন্দ্রভানুবাবু যখন মতিহারিতে নিজের বাড়িতে এলেন তখন জ্যোতি চারদিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে, "এসব কার?"

চন্দ্রভানু বললেন, "এ সবই তোমার। তোমার জন্যেই এ-সব আমি কিনে রেখেছি।"

"এই সাইকেলটা?"

"সাইকেলটা তোমার।"

জ্যোতি বললে, "কিন্তু আমি তো সাইকেল চালাতে জানি না। বাবা আমাকে সাইকেল চড়তে দেয়নি।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমি তোমাকে সাইকেল চড়াতে শিখিয়ে দেব। সে-জন্যে আমার লোক আছে। তাকে বললেই সে তোমাকে চড়া শিখিয়ে দেবে!"

"আর এই ফুটবলটা?"

"ওটাও তোমার।"

"এই রেডিওটা?"

"ওটাও তোমার। এই বাড়ি-ঘর-দোর, সব কিছুই তোমার। সমস্ত বাড়িটাই তোমার। এই বাড়ির লোক-জন সব তোমার জন্য। তুমি ওদের যা হুকুম করবে ওরা তাই-ই করবে!"

"আর ওই যে মোটর গাড়িটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা?"

"ওটাও তোমার। ও-রকম আরো অনেক গাড়ি আছে, সবগুলো তোমাকে দিয়ে দেব।"

"আমাকে মোটর গাড়ি চালাতে শিখিয়ে দেবে?"

"হ্যাঁ, ড্রাইভারকে বললেই তোমাকে মোটর চালাতে শিখিয়ে দেবে। তারপর যখন

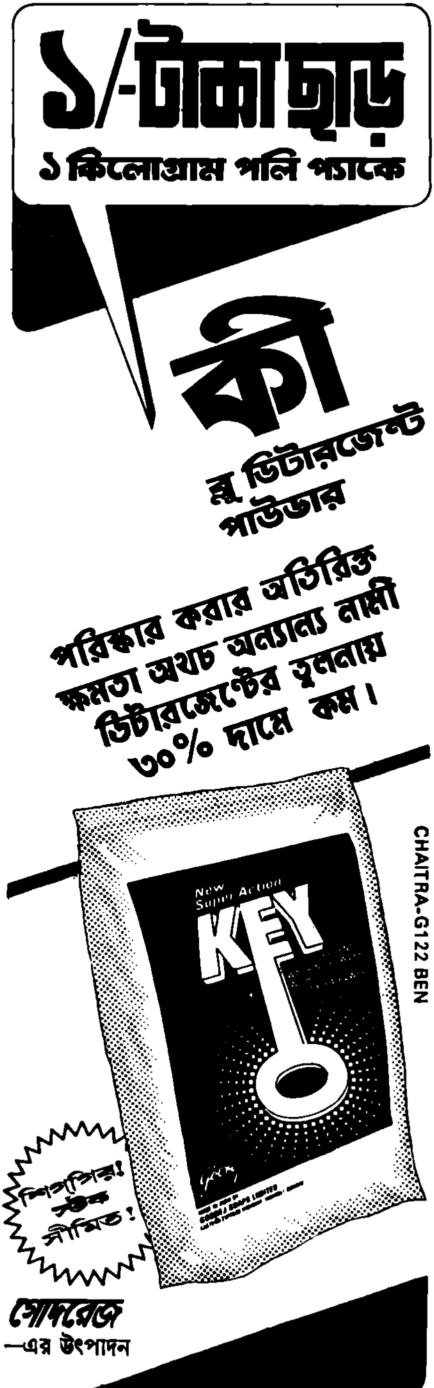

তুমি আর একটু বড় হবে তোমার নামে লাই-সেন্স করিয়ে দেব।”

প্রথম-প্রথম কদিন বেশ কাটল। পুরনো কথা, কলকাতার কথা সব কিছু জ্যোতি ভুলে গেল। একটা লোক রেখে দিলেন চন্দ্রভানুবাবু জ্যোতির জন্যে। সে সাইকেল চড়ানো শেখাতে লাগল জ্যোতিকে। তখন থেকে জ্যোতি একাই সাইকেল নিয়ে টো-টো করে ঘুরতে লাগল। কত লোক তার সাইকেলের তলায় চাপা পড়ল তার ঠিক নেই। চন্দ্রভানুবাবুর ভাইপো বলে কেউ কিছু নালিশ করতে ভয় পেলে।

শেষকালে ধরল গাড়ি।

ড্রাইভার এসে একদিন বাবুকে জিজ্ঞেস করলে, “বাবু, ছোটবাবু বলছে গাড়ি চালাবে।”

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, “তা দে না চালাতে! তুই কিন্তু ওর হাতে স্টীয়ারিং দিলেও সব সময় পাশে বসে থাকবি।”

“ঠিক আছে হুজুর।”

তা সেই হল শুরু। চন্দ্রভানুবাবু নিজের কাজেই বেশিক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। বাড়িতে জ্যোতি কী করছে তা দেখবার বেশি সময় পেতেন না। সকলেই জানত চন্দ্রভানুবাবুর ভাইপো হচ্ছে জ্যোতি। সে যা চাইবে তাই-ই তাকে দিতে হবে।

ড্রাইভারও আর তাকে কিছু বলত না। রাস্তা দিয়ে জ্যোতি নিজেই মাঝে-মাঝে গাড়ি চালাত। লাইসেন্স নেই, তবু চালাত। এ-খবর চন্দ্রভানুবাবুর কানে আসত না।

কিন্তু সেদিন যখন প্রথম কানে এল তখন দেরি হয়ে গেছে। তিনি ছুটলেন গাড়ি নিয়ে। গিয়ে দেখলেন গাড়িটা খাদে পড়ে আছে। আর তার পাশে জ্যোতি পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তাড়াতাড়ি তাকে দুহাতে ধরে নিজের গাড়িতে তুললেন। তারপর সোঁ-সোঁ করে সোজা চললেন হাসপাতালের দিকে।

চন্দ্রভানুবাবুর অখণ্ড প্রতাপ মতি-হারিতে। ডাক্তার-নার্স যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য জ্যোতিকে নিয়ে ডাক্তাররা স্ট্রেচারে করে ভেতরে নিয়ে গেল।

চন্দ্রভানুবাবুর বুক তখন কাঁপছে। এত দিনকার এত চেষ্টা, এত দিনকার এত কষ্ট,

সব কি তাহলে ব্যর্থ হল? সেবার হল ট্রেন-অ্যাকসিডেন্ট, আর এবার হল মোটর-অ্যাকসিডেন্ট!

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তাররা জ্যোতিকে নিয়ে ভেতরে অপারেশন থিয়েটারে চলে গেল।

চন্দ্রভানুবাবু একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভাইপোর কী হয়েছে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এক্স-রে করে দেখতে হবে।"

চন্দ্রভানুবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বাঁচবে তো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখি।"

জ্যোতিকে নিয়ে তারা সবাই ভেতরে চলে গেল। চন্দ্রভানুবাবু বাইরের লম্বা ঢাকা বারান্দায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

এদিকে চান্দোলিতে সূর্যনারায়ণবাবু আর জয়রামবাবু তখনও একমনে প্রতীক্ষা করছেন। চারদিকে খবর পাঠানো হয়েছে দেবুকে খুঁজে বার করবার জন্যে। এক-একজন ফিরে আসে আর সূর্যনারায়ণ অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "কী রে, পেলি?"

"না বড়বাবু।"

বড়বাবু রেগে যান। "পেলি না মানে? তাহলে দেবু কি উড়ে গেল নাকি?"

আজ্ঞে হুজুর, সব জায়গাতেই তো গেলুম। কোথাও না পেলে কী করব?"

দারোয়ান খুঁজতে বেরিয়েছিল। সে এসেও সেই একই কথা বললে।

জয়রামবাবু বললেন, "তুমি ছেলেকে বকতে গেলে কেন ভাই? জানো তো আজকালকার ছেলেরা আমাদের সেকালের মতো নয়। আজকাল কোনও ছেলে বাপ-মায়েদের কথা শোনে না।"

"আরে ও তো আমার নিজের ছেলে নয়।"

"তা না হলেই বা, তুমি তো ওকে নিজের ছেলে বলেই মানুষ করছিলে! যাক যা হবার হয়ে গেছে। সে যাবে আর কোথায়? নিশ্চয়ই এদিকে-ওদিকে কোথাও গেছে। অত ভাবছ কেন তুমি? দেখবে সন্ধে হলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে।"

খবর পেয়ে চৌবেজি এসে হাজির। এসে বড়বাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। তারপর বললে, "শুনলুম খোকাবাবুকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বড়বাবু?"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ তুমি ঠিকই শুনেছ, তুমি কোত্থেকে শুনলে?"

"আপনার দারোয়ান চাকর সবাই তো আমার দোকানে গিয়েছিল। আমি তো দোকানে ছিলুম না, আমি সওদা করতে গঞ্জে গিয়েছিলুম, বাড়িতে ফিরে এখন শুনলুম। তাই দৌড়ে এসেছি কী ব্যাপার জানতে!"

বড়বাবু বললেন, "আমার কাছে তো ছিল সে। যখন যা আবদার করেছে আমি তাকে তাই-ই দিয়েছি। রাস্তার অন্ধ খোঁড়া ভিখিরি, ঘাটের সাধুদের বাড়িতে ডেকে আনত। তার তাগাদায় কাউকে দু টাকা, কাউকে পাঁচ টাকা দিয়েছি। ভেবেছি কত দিকে তো কত টাকাই চলে যাচ্ছে, দেবু যদি খুশি থাকে তো তাই-ই হোক। কিন্তু একদিন এক ব্যাটা ভণ্ড সাধুকে ডেকে এনে বলে একে পঞ্চাশ টাকা দাও, কম্বল কিনতে—"

"পঞ্চাশ টাকা?"

"হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকাই দিলুম। কিন্তু দিয়েই ভাবলুম এ তো ভাল কথা নয়। আমি তো দান-ছত্তোর খুলে বসিনি। এর একটা বিহিত করা দরকার। বলে দারোয়ান পাঠিয়ে সাধু-ব্যাটার কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। তাইতেই রাগ হয়ে গেল বাবুর।"

"তারপর?"

"তারপর বোধহয় জানতে পেরেছে ব্যাপারটা। আমাকে এসে যখন বলল তখন আমি যা-তা বললুম তাকে, সে-ও আমাকে যা-তা কথা শোনালে। তারপর রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। আর তার পর থেকেই নিখোঁজ।"

সব শুনলে দেবরাজ চৌবেজি। বললে, "ঠিক আছে, আমিও একটু খোঁজ করে দেখি—"

বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

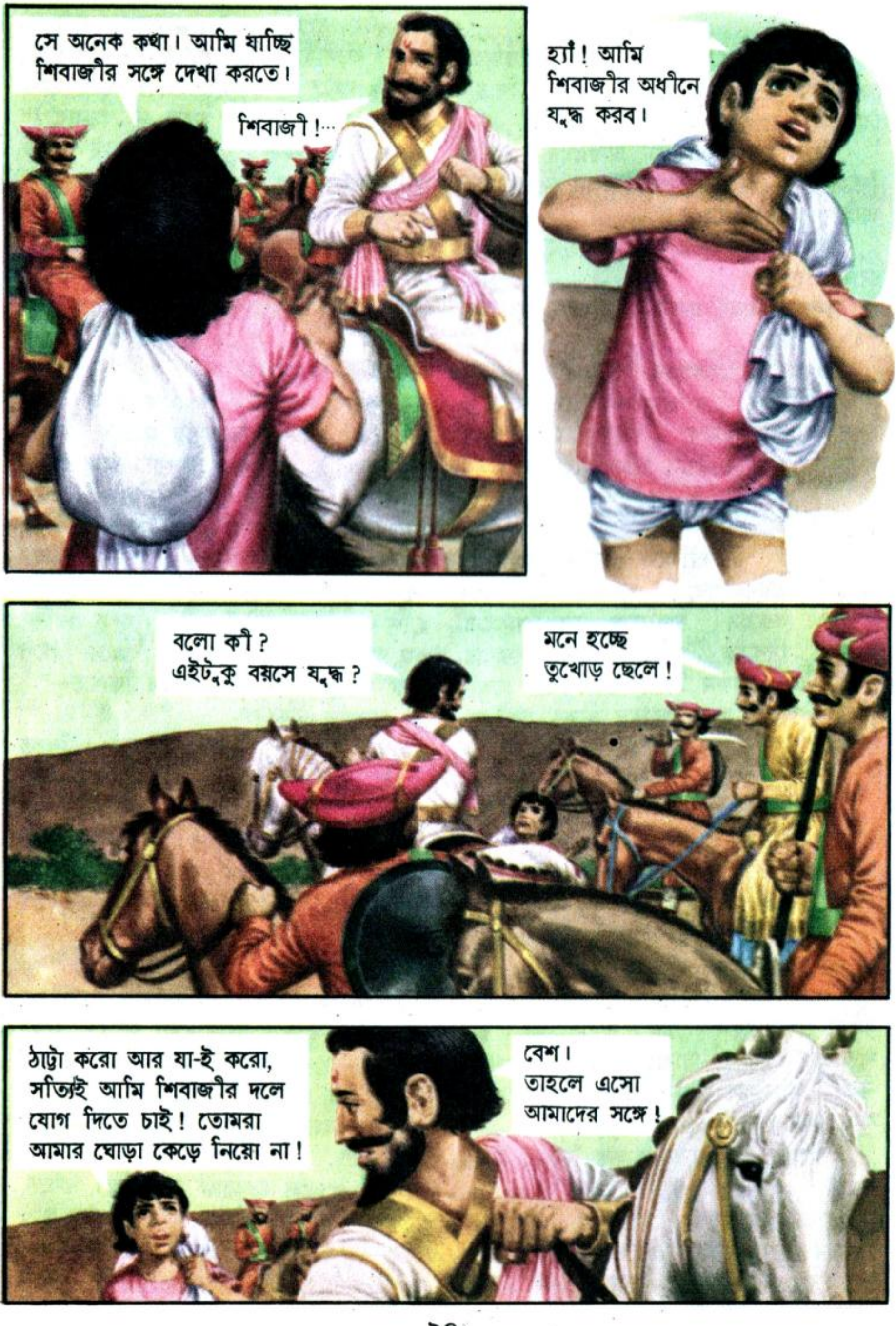

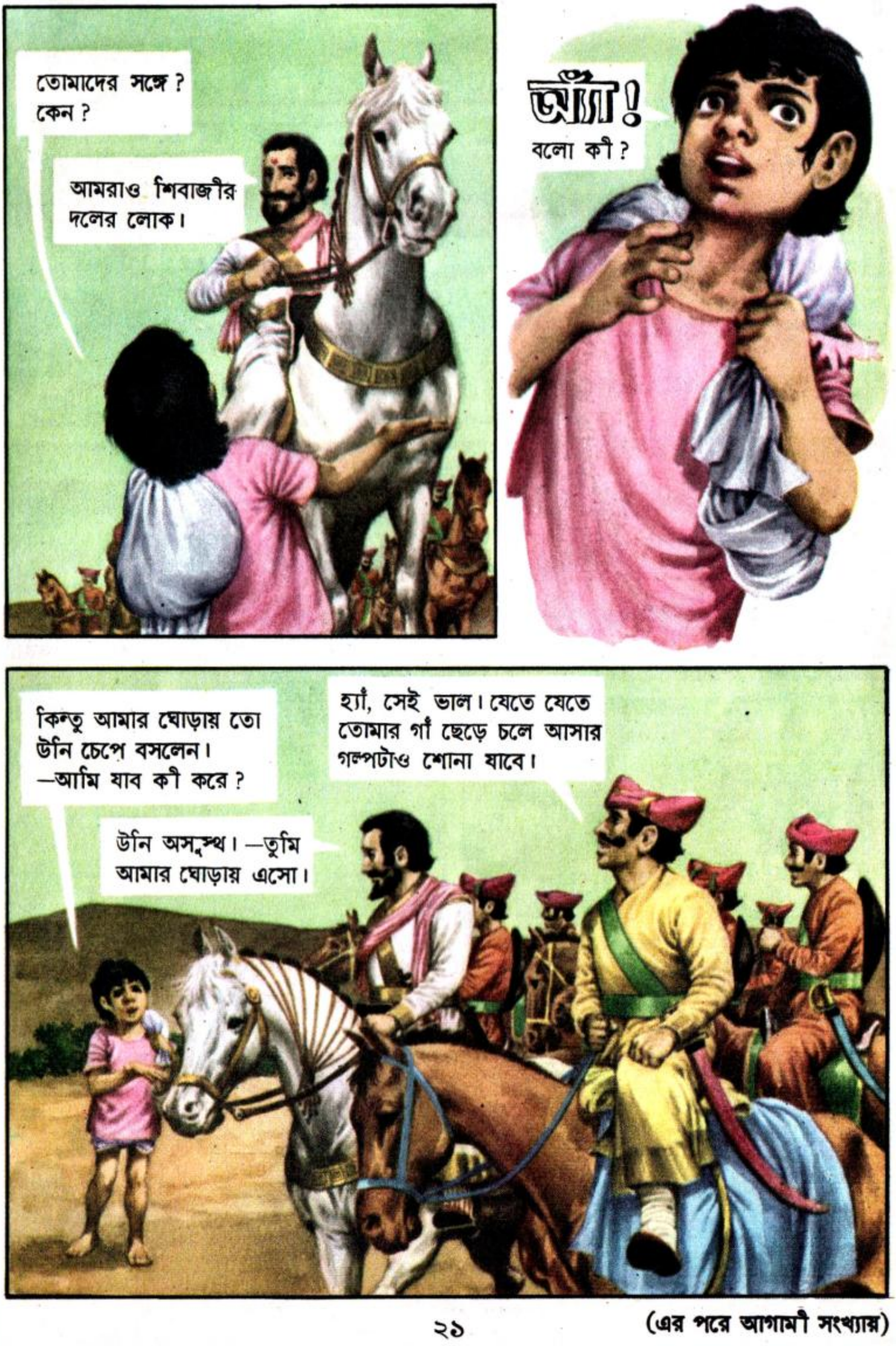

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্সের সঙ্গে যখন মেলবরোর খেলা চলছে, মাঠে তখন খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজার মোটর-দুর্ঘটনায় আহত····
রয়কে ম্যানেজার করা হোক!
রয়কে চাই !
ROVERS
ক্লাব-ম্যানেজার বেন গ্যালোয়ে দর্শকদের জানাচ্ছেন····
এ-ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আমি একমত···
এফ-এর কর্তারাও সম্ভবত তা-ই চান !
হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ম্যানেজার হবার জন্য রয়কে তাঁরা ডেকেছেন !
রয় ! রয় !
ROVERS
খেলোয়াড়রা রয়কে চাইবে কি না, সেটাই প্রশ্ন !
ঠিক বলেছ !
রয় ও-সব ভাবছে না, সে খেলে যাচ্ছে !
চমৎকার পাস !
ভার্নন দূরে রয়েছে !
কর্নার-ফ্ল্যাগের দিকে ছুটছে ও !
শাবাশ !
মেলবরো-ব্যূহ বিধ্বস্ত····
রয় হেড করবে !
গোলে হেড না-করে বরং····

এই নে টোরি!
সর্বনাশ!
জিমি স্লেডের জায়গায় টোরি কীলান খেলছে…
সামনে বল পড়তেই সে শট করল !
গো-ও-ল !
কায়দাটা দেখলে ? রয়ের সত্যি তুলনা নেই !
সবাইকে নাচাচ্ছে !
মেলবরোর সভ্যরাও এখন রয়ের সমর্থক !
রয়কে আমরা ইংল্যান্ডের ম্যানেজার হিসেবে দেখতে চাই !
রয়কে চাই !
রয় তো অবাক !
রয়কে চাই !
সে কী, ওরাও আমাকে চায় !
শুনছ রয় ?
সবাই তোমাকে চায় ! সব্বাই !
দুরন্ত গতিতে খেলছে রয়
রয় হ্যাটট্রিক করল !
কী খেলা !
এফ-এর সদর-দফতরে…
রয়, তুমি তাহলে রাজি ?
রাজি, কিন্তু আমার শর্তে !
এই দলকে ভেঙে…
নতুন করে দল গড়তে চাই আমি ! এই নিন তালিকা !
অ্যাঁ ?
এ তো ব্যালান্সড দল হল না !
মিডফীল্ড দুর্বল !
হল্যান্ড সেই দুর্বলতার সুযোগ নেবে !
এর পরে আগামী সংখ্যায়

ক্যাপ্টেন যখন পুলিস খুঁজছে…
জাহাজ থেকে ডিঙি আসছে। কে আসছে ওই ডিঙিতে?
জনসন আর রনসনকে ডাকা যাক…
রিরিরিং…
রিরিরিং…
রিরিরিং…
টেলিফোন বাজছে না?
তাই তো মনে হচ্ছে!
ওরা ক্যালকুলাসকে বয়ে আনছে!
রিরিরিং
টেলিফোনটা ধরো!
কী করে ধরব, আমি ঘুমুচ্ছি না?
সাড়া দিচ্ছে না কেন?
রিরিরিং…
ঘুমুচ্ছ তো কথা বলছ কী করে?
ঘুমের মধ্যেই আমি কথা বলি!
ফোন ধরছে না! আচ্ছা পাজি তো!
এবারে আমি ধরছি, পরের বারে তুমি ধরবে!
রিরিরিং…
রিরিরিং…
কে? জনসন?… আমি ক্যাপ্টেন হ্যাডক। যা বলছি, শোনো…
কে?… হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি… ক্যালকুলাস? …কোথায়? আঁ, আচ্ছা এখুনি আসছি…
আধ ঘণ্টা বাদে…
এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে!
ওই তো আমাদের নৌকো… কিন্তু টিনটিন কোথায় গেল?
টিনটিন!
টিনটিন!
টিনটিন!
নেই! কোথায় গেল? পায়ের চিহ্ন খোঁজো।
খুঁজছি, কিন্তু…
পাওয়া গেলে হয়!
এই তো পায়ের ছাপ!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

মাধবপুরে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ছবি দেবাশিস দেব

আয় রে সবাই, মাধবপুরে আয়
হেথায়   খেঁকশেয়ালের হট্টগোলে
দু'কান পাতা দায়।

হেথায়   সাদার মানে বেগুনি
আর   কালোর মানে নীল
সত্যি কথা বলতে গেলে
সবাই মারে ঢিল।

রামছাগলে গান জুড়েছে
গাধার পিঠে পাখি
সবাই এসে, মাধবপুরে
থাকছে পাকাপাকি।

হেথায়   রিকশো আছে তিনশো
আর   মানুষ আছে লাখ,
থলি হাতে, বাজার করে
কারো মাথায় টাক।

ধম্ম আছে, কম্ম আছে,
আছে বাড়াবাড়ি,
পুজোর দিনে পুরুত এলে
পড়ে কাড়াকাড়ি।

আয় রে সবাই, মাধবপুরে আয়.
লুঙ্গি পরে চটি পায়ে
কিংবা খালি পায়।

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৪৩ ॥

নিজের হাত দুখানা নিয়ে মুশকিলে পড়লুম। কোথায় রাখব দুখানা হাত? প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দেব? না, পেছন দিকে বাঁ-হাতে ডান হাতের কব্জি ধরে রাখব? কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলুম না অন্য জগতে এসে। অন্য জগতে মানে ছায়ালোকে।

হ্যাঁ, আমি একবার সিনেমায় নেমেছিলুম। অভিনয় করতে গিয়েই হাত দুখানি নিয়ে পড়েছিলুম মহা সমস্যায়। সেটা সাতষট্টি সালের কথা। ফুটবল ও ক্রিকেট নিয়ে আমার মনে তখন টানা-পোড়েন চলেছে।

ঠিক ওই সময় আমার এক বিশেষ বন্ধু ফিল্‌ম ডিরেক্টর অজয় বিশ্বাস সিনেমায় নামার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হল। ছবির নায়ক ছিল আমার আর-এক বন্ধু বিখ্যাত চিত্র-তারকা বিশ্বজিৎ। নায়িকা সন্ধ্যা রায়।

অবশ্যই প্রথমে আমার দ্বিধা ছিল। আবার শখও না ছিল এমন নয়। কারণ আমাদের খেলোয়াড়দের সাধারণ মানুষ একটু অন্য চোখে দেখলেও ছায়ালোকের মানুষদের সবাই ভাবে স্বপ্নলোকের মানুষ। তবু সহজে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছিলুম না। অজয় বলল, "আরে বাবা, নির্দোষ আমোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি অভিনয় করবে তোমার নিজের ভূমিকায়। অর্থাৎ চুনী গোস্বামী নামেই তুমি সিনেমায় নামবে। এর ফলে তোমার জীবনের গতিও বদলে যেতে পারে। দ্যাখো, জনি উইসমুলার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু হিসাবে যতখানি পরিচিত তার চেয়ে তাঁর অনেক বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করে। তুমি আর আপত্তি কোরো না।"

ছবিতে আমার অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল: নায়ক (বিশ্বজিৎ) একজন দারুণ উঠতি ক্রিকেটার, স্পোর্টসম্যান চুনী গোস্বামী তাকে একখানি ক্রিকেট ব্যাট উপহার দিচ্ছে, সেই সূত্রে চুনীর মুখে দু'চারটি কথা।

সিনেমা-স্টুডিয়োতে চুনী

আমি তো শেষ পর্যন্ত রাজি হলুম। কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে স্পোর্টসম্যান চুনী গোস্বামীর অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। সে হাত দুখানি নিয়ে পড়ল বিপাকে। যে হাতে সে ব্যাট করেছে জড়তাহীনভাবে, বল করেছে সহজ ছন্দে, ফুটবল খেলায় গোল করার পর দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে হাত তুলেছে আকাশের দিকে, সেই হাত কোথায় রাখবে অভিনয় করার সময়, সে তা ঠিক করতে পারছিল না।

যাই হোক, আমার নিজের ভূমিকায় আমার নিজের ছোট্ট অভিনয় কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলুম, সে-কথা তাঁরাই বলতে পারবেন, যাঁরা ছবিখানি দেখেছেন। আমি কিন্তু খুশি হতে পারিনি এবং ভালভাবেই বুঝে গিয়েছি যে, চিত্রতারকা হওয়া আমার ধাতে নেই।

এই সংখ্যায় ঢাকায় যাবার কথা লেখার প্রতিশ্রুতি ছিল। লিখছি।

পঁচাত্তর সালের জুলাইয়ের শেষদিকে মোহনবাগান ক্লাবে এবং আমার কাছে আমন্ত্রণ এল ঢাকা থেকে। আটই আগস্ট বাংলা দেশে প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরি উদ্বোধনের সময় মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকি। সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ঢাকায় গেলুম। আমি ও করুণাদা—করুণা ভট্টাচার্য।

আতিথেয়তায় যতখানি খুশি হয়েছিলুম তার চেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলুম উষ্ণ আন্তরিকতায়। লাইব্রেরির হল-এ ঢুকতেই গুরু-গম্ভীর কণ্ঠের সাদর আহ্বান—"এসো এসো, চুনী এসো। তুমি আমাদের যশোদলের যশ, বাংলা দেশের গর্ব।"

আগেই লিখেছি, আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার যশোদল গ্রামে। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলুম না, ও'রা কীভাবে আমার গ্রামের নামটি জানলেন। পরে শুনলুম বাংলা দেশের তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট তাজউদ্দিনের জন্মও যশোদল গ্রামে। আমার কাকার বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাই স্কুলে দুজন একসঙ্গে পড়তেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান এবং তাজউদ্দিন পুত্রস্নেহে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এখনকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও স্পোর্টস লাইব্রেরির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ওপার বাংলার সঙ্গে কখনো আমি নাড়ির যোগ অনুভব করিনি। সেদিন কিন্তু মনে হয়েছিল পৃথক রাষ্ট্র হলেও বাংলা দেশের সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গের অন্তরের যোগ অচ্ছেদ্য। পনেরোই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান নিহত হবার সাতদিন আগে স্পোর্টস লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়েছিল। গোটা পশ্চিম বাংলার মানুষ কে'দে উঠেছিল বঙ্গবন্ধু নিহত হবার সংবাদ শুনে। মাত্র সাতদিন আগে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল বলে ব্যথাটা আমার বুকেও কম বাজেনি। ক'দিন পরে আবার নিহত হলেন কাকার বন্ধু তাজউদ্দিন। তাইতো লিখেছি ঢাকার কথা মনে পড়লেই ব্যথায় মন ভরে ওঠে—ও'দের মুখগুলি ভেসে ওঠে চোখের উপরে।

স্কুল-জীবন থেকে শুরু করে খেলতে খেলতে কাটিয়ে দিয়েছি দীর্ঘ পঁচিশটি বছর। এই 'আনন্দমেলায়' খেলার কথা লিখতেও তো সাড়ে তিন বছরের উপর কেটে গেল। কথা প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে। এবার নটেগাছটি মুড়োবার পালা। মুড়োবার আগে কত কথাই মনে পড়ছে। ভাবছি কী পেয়েছি আর কী পাইনি। যা পাইনি, আমার অ্যামেচার জীবনে যা পাবার সম্ভাবনাও ছিল না, তা নিতান্ত তুচ্ছ। ঈশ্বরের আশীর্বাদে যা পেয়েছি তার মূল্য অপরিসীম। কিছু-কিছু কথা আগে লিখেছি। আমার প্রতি মানুষের ভালবাসার কিছু কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছি। ভেবেছি, মানুষের এত ভালবাসা তো খেলারই জন্য। দুটি-একটি ঘটনার কথা বলছি।

মেদিনীপুরে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার কথা ছিল আমাদের। তিন-চারখানা মোটরগাড়িতে কলকাতা থেকে খেলোয়াড়রা যাচ্ছিল মেদিনীপুরে। গাড়িগুলি যাত্রা করেছিল পাঁচ-সাত মিনিট পর পর। খড়গপুরে বুড়োমতো এক বাঙালি পুলিস-কর্মী প্রতি গাড়ি থামিয়ে তার মধ্যে আমাকে খ'ুজছিলেন আর মুখে বলছিলেন, "কই, আমার সোনামানিক চুনী গোস্বামী কই?" বৃদ্ধ পুলিসটি খান চারেক টিকিট কিনেছিলেন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ দেখবেন বলে। প্রতি গাড়ি খ'ুজে শেষ গাড়িতে যখন আমাকে পেলেন না এবং শুনলেন আমি মেদিনীপুরে খেলতে যাচ্ছি না, তখন দারুণ হতাশায় ও রাগে টিকিটগুলো টুকরো-টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলে দিলেন। আমি ঘটনাটা শুনেছিলুম আমার খেলোয়াড় বন্ধুদের কাছে। এই বৃদ্ধ পুলিসটির ভালবাসার দাম আমি কোনোদিনই তো দিতে পারিনি।

আর একটি ঘটনা। তখন আমার টপ ফর্ম। হাওড়া স্টেশন থেকে বাইরে যাচ্ছি ট্রেনে চেপে। বিয়ের পার্টির সঙ্গে নতুন বিয়ে হওয়া বর-বউ উঠেছিল ওই ট্রেনেই। তখনো গাঁট-ছড়া বাঁধা। বরের মাথায় বিয়ের টোপর, কনের মাথায় শোলার মুকুট। ছেলেটি নিশ্চয়ই মোহনবাগানের দারুণ ফ্যান ছিল। কীভাবে যেন জেনেছে আমিও যাচ্ছি ওই ট্রেনে। গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় ছেলেটি প্রায় দৌড়তে শুরু করল। নতুন বউয়ের অবস্থাটা বোঝো। বেচারি তাল সামলাতে পারছে না। পড়ে যায় আর কী। কাছে এসেই মাথার টোপর হাত দিয়ে ধরে রেখে বর আমাকে প্রণাম করে বসল। বউকে বলল, "প্রণাম করো, তোমার ভাগ্য ভাল। আমার গুরুর দেখা পেয়ে গেলে।" বহু মানুষের কৌতূহলী চোখের সামনে এই ঘটনা। আমার মুখ তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

ছেলেটির ওই আচরণ একরকমের পাগলামি বলে ধরে নিয়েছিলুম। কিন্তু এই

খেলা-পাগলদের প্রীতি ও ভালবাসাই তো আমাকে ঋণী করে রেখেছে।

জীবনে এমন কত ঘটনাই ঘটেছে। সব লেখা যায় না। লেখা উচিতও নয়। চিঠি-পত্র যা পেয়েছি তাও গোপন রাখছি। ছোট আর-একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। হায়দরাবাদের স্টেট ব্যাঙ্ক ট্রেনিং কলেজ থেকে আমি কলকাতায় ফিরছি। দক্ষিণ ভারতীয় এক বয়স্ক ভদ্রলোক গায়ে পড়ে আলাপ জমালেন আমার সঙ্গে। কথা বলতে-বলতে বুঝলুম ভারতীয় ফুটবলের সব-কিছু তাঁর নখদর্পণে। কোন্ রাজ্যে কোন্ খেলোয়াড় উঠছে তারও খবর রাখেন। আর-এক ফুটবল-পাগল। আলাপ ভালভাবে জমে ওঠার পর ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে সামান্য কিছু দিতে চাই।" বলেই ছোট সুটকেস থেকে খুব দামি এক পিস কাপড় বের করলেন, যা দিয়ে গোটা দুই শার্ট তৈরি হতে পারে। দাম জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, "হ্যাঁ, দাম নিশ্চয়ই নেব. কিন্তু পয়সা নয়। আপনার গায়ের শার্টটি আমি স্মৃতি হিসাবে কাছে রেখে দিতে চাই।"

ফুটবল খেলে এই সব ফুটবল-ভক্তদের যদিও বা কিছুটা আনন্দ দিয়ে থাকি, এখনকার ছেলেদের, যাদের অনেকেই জন্মেছে আমি খেলা ছাড়ার পর, কী দিয়েছি? কিছুই না। তবু তারা যে এখনো আমাকে মনে করে, আমার স্বাক্ষর চায়, এটাই আমার জীবনের বড় সম্পদ।

ফুটবলের রাজা পেলের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করাকে আমি ধৃষ্টতা মনে করি। গর্ববোধ করি পেলের কথার সঙ্গে আমার কথা যোগ করতে। পেলে বলেছেন, সাধারণ মানুষ তাকে একজন সাধারণ সরল মানুষ হিসাবে মনে রাখবে—এটাই তাঁর কাম্য। আমার কামনাও পৃথক নয়।

খেলার কথা লেখা শুরু করার আগে এই পত্রিকার সম্পাদক একটি দামি কথা বলেছিলেন, যে কথাটি আমার মনে দাগ কেটেছিল। বলেছিলেন, "এমন পবিত্র পত্রিকা কোথাও পাবে না।" সব সময় সে-কথাটি মনে রেখে লেখার চেষ্টা করেছি। তোমাদের কতটা খুশি করতে পেরেছি জানি না। যদি কিছুটাও পেরে থাকি, তবে সেটা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে আমার গোল পাওয়ার মতোই সাফল্য মনে করব। (সমাপ্ত)

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যা (২১ মে) থেকে
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে
শিশিরকুমার বসুর
অসামান্য স্মৃতিকথা

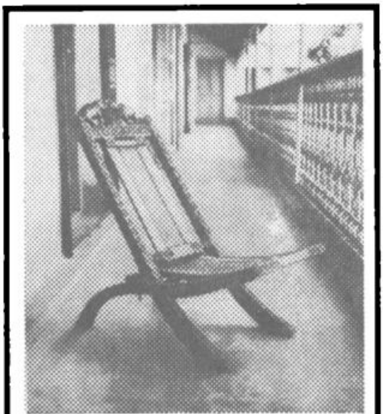

বসু-বাড়ি

নেতাজী-পরিবারের
ভিতর-মহলের পবিত্র স্পর্শ লেগে
আছে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র
ডঃ বসুর এই লেখায়। আছে
একদিকে কোমল ও মধুর এবং
অন্যদিকে রোমাঞ্চকর ও
উদ্দীপনাময় এমন অনেক ঘটনার
খবর, আজও যা কেউ
জানে না। সঙ্গে থাকবে ইতিপূর্বে
অপ্রকাশিত অনেক ছবি।

স্টেট ব্যাঙ্কের ট্র্যাভেলার্স' চেক সঙ্গে নিয়ে নির্ভাবনায়, নিরাপদে ভ্রমণ করুন ।

- ৫০/-, ১০০/-, ৫০০/- আর এখন **১০০০/- টাকারও** নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার এবং তার সহযোগী ব্যাঙ্কের ৭৫০০'রও বেশী অফিসে এটি পাওয়া যায় ।
- এটি ইস্যু এবং নগদ করার জন্যে কোনোরকম খরচা লাগে না ।
- আপনার যতদিন খুশী ততদিন পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকে ।
- শুধু সই করেই টাকা নগদ করানো যায় ।
- যদি এটি হারিয়ে ফেলেন তাহলেও যে অফিস এটি ইস্যু করেন সেখান থেকে টাকা ফেরত পেতে পারবেন ।
- তাই, আপনার রেলভাড়া, হোটেল খরচা আর জিনিষপত্র কেনার টাকা, আমাদের ট্র্যাভেলার্স' চেকেই পরিশোধ করুন । সারা ভারতে ২৫,০০০-এরও বেশী স্থানে এটি নগদ করানো যায় ।

স্টেট ব্যাঙ্ক
ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভেলার্স চেক

যে টাকা কেউ লুটে নিতে পারে না

SB 5330 R

সুমনের কথা রাখা

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমনের মা বললেন, এবার পুজোয় সুমনকে তিনি মামাবাড়ি যেতে দেবেন না। সুমন অবাক হয়ে গেল। "পুজোর সময় আমি মামাবাড়ি যাব না?"

মা বললেন, "পুজোর পরেই পরীক্ষা, ওখানে গেলে পড়াশুনোর ভীষণ ক্ষতি হয়, তারপর আসার সময় একটা অসুখ বাধিয়ে আসবে, সেও এক কাণ্ড।"

সুমন কিন্তু এখন আর ছোটটি নেই, সে ক্লাস সেভেনে পড়ছে।

সুমনের মা ছেলেকে খুশি করার জন্য বললেন, "প্রতিবারই তো গাঁয়ের পুজো দেখিস এবার না হয় কলকাতার পুজো দেখলি! কত ঠাকুর! আলোয় আলোয় কলকাতা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়!"

সুমন ভাবছিল মাকে এখন সে কী করে বোঝায় যে, মামাবাড়ির পুজোয় সে শুধু পুজোর আনন্দেই যায় না! সমস্ত গ্রামখানিই যে তাকে টানে! ওখানে আলোর মেলা নেই, এত ঠাকুর নেই, কিন্তু কিছু না থেকেও যা আছে তার ছিটেফোঁটাও এখানে নেই।

চোখ বুজলেই সুমন সেই অনেক দূরের গ্রামের পুজোমণ্ডপ দেখতে পায়। ওখানে মাত্র দুটি পুজো একটি একেবারে বাড়ির কাছাকাছি, মনে হয় যেন বাড়ির পুজো।

ওখানকার পথের প্রতিটি মানুষকে তার কত আপনার মনে হয়। মনে হয় সে এই গ্রামেরই ছেলে, শুধু পড়াশুনোর জন্য তাকে কলকাতায় থাকতে হয়। কত ভালবাসা পায় সকলের কাছে।

সকাল হলেই দাদুভাইয়ের সঙ্গে বাজারে যায়। এখানে-ওখানে মিষ্টির দোকানে। দাদু-ভাই বাজার করেন, মিষ্টি অর্ডার দেন। সুমন দেখে, দাদুভাই কত গল্প করেন সবার সঙ্গে। সুমনের বাবাও তো বাজারে যান, জিনিস কেনেন, কিন্তু সেখানে এমন বাড়ির গল্প হয় না! শুধু কেনাকাটি হয়। গ্রামের ফড়িং-ওস্তাদ (মিষ্টি তৈরিতে তার খুব নামডাক, তাই সবাই ওস্তাদ বলে) কত খুশি হয়ে বলে, "কাল এলে বুঝি খোকাবাবু? বাব্বা! অনেকখানি লম্বা হয়েছ দেখছি।" আদর করে সুমনকে ছানার গজা খাওয়ায়।

দাদুভাই দাম দিতে গেলে ফড়িং-ওস্তাদ শুকনো মুখে বলে, "সে কি বড়বাবু, নাতি বুঝি শুধু আপনারই, আমাদের কেউ নয়!" শুনে সুমনের দাদু লজ্জা পান।

এসব সুমন কোথায় পাবে? এই কলকাতায়? এখানে মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে গেলে কেউ কি ডাকাডাকি করে বলবে—এসো এসো, অ্যাদ্দিন বাদে এলে, স্পেশাল ছানার জিলিপি খেয়ে যাও? কেউ ডাকবে না, কেউ বলবে না, এখানে কত চেনা মানুষই চিনতে চায় না।

ওখানে পাড়ায় প্রতিটি বাড়ি থেকে একই-রকমের সুবাস বেরোয়। নারকেল নাড়ু, নতুন গুড়, নতুন চালের এক অপরূপ গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত সুমনের দিদিমণি মামিমারা কত কি তৈরি করেন। মাঝরাতে ঘুমভাঙা চোখে সে দেখে।

এখানে সে সব কিছুই হয় না। ওর মা সে সব তৈরি করতেই জানেন না। বলেন, "কে অত সব করে বল, আমি তোকে কেক, পেস্ট্রি করে খাওয়াব।"

পুজোর সময় কেউ বুঝি কেক পেস্ট্রি খায়! সুমন মাকে বলতে গিয়েও বলতে পারে না। কি জানি, মা হয়ত কষ্ট পাবেন! আহা! জানেন না বলেই হয়ত তাকে ভোলাতে ওইসব বলেন।

সকাল থেকে সুমন খুব শান্ত হয়ে আছে। বায়না নেই আবদার নেই, একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছে সে। আকাশে ঘুড়ি কাটাকাটি হচ্ছে, সুমনের সেদিকে নজর নেই। বাবার

ভূত-ভবিষ্যৎ

তোমাদের কাছে আজ একটা গল্প বলবো। যার আধখানা অতীত, আর অর্ধেকটা ভবিষ্যৎ।

এমনি গল্প আবার হয় নাকি :—জিজ্ঞেস করবে তোমরা। হয় হয়। শোন বলি।

আজ থেকে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আজ যেখানে গড়িয়াহাট বাজার, ত্রিকোণ পার্ক, দেশপ্রিয় পার্ক বা প্রিয়া সিনেমা অর্থাৎ কিনা রাসবিহারীটা গোটাটা, এ সমস্ত কিন্তু ঝোপঝাড়, ডাব নারকেল আর দিনে দুপুরে শিয়াল ডাকার মাঠ ছিল। যাদবপুরের তো নামই মুখে আনছি না ভয়ে। সেসব কি জায়গাই যে ছিল। এঁদো, মশা, জলা-জঙ্গল আর সাপ খোপ ব্যাঙ। আর আজ? আজ তো দক্ষিণ কলকাতা হল হালের ফ্যাশন।

ওমনি একটা গল্প তৈরী হচ্ছে কিন্তু ঠিক কসবার পিছনে। পূর্ব কলকাতার নতুন উপনগরী। ধূ ধূ মাঠে হাজার হাজার মজুর, শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক, পাকা পাকা টাউন প্ল্যানার হৈ হৈ করে কাজ করে চলেছে। তাঁদের চোখে কিন্তু একটাই স্বপ্ন। ভবিষ্যতের। আজকের মাটি কাটা, মাটি-ফেলা অফুরন্ত মাঠে এঁরা দেখছেন নতুন এক উপনগরীর মানচিত্র। বড় ছোট নানান মাপের বাড়ি, রাস্তাঘাট, স্কুল-বাজার, ব্যাঙ্ক-ফায়ার ব্রিগেড, অফিস-কাছারী, জলের পাইপ, ভূগর্ভ নর্দমা, গরীব মানুষের জন্য অল্প পয়সায় থাকবার ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে নতুন এক কলকাতা। নতুন অথচ বিচ্ছিন্ন নয়।

এ কলকাতা তোমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠছে একটু একটু করে।

তোমরাও বড় হয়ে তোমাদের ছোটদের কাছে আজকের এই গল্প করবে। করবে না? ততদিনে অবশ্য নতুন উপনগরীগুলোও আবার ভিড়ে ভিড়ে ভরে উঠবে। তাই স্বপ্ন দেখার আর শেষ হবেনা কোনদিনই।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

সঙ্গে কথা নেই. ডাকলেও কাছে যাচ্ছে না। আর মায়ের চোখে চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

দেখে-শুনে সুমনের মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "মন খারাপ করার দরকার নেই, পুজোয় মামাবাড়িই যাবে। রাধু তোমাকে রেখে আসবে।"

এই রাধুদাই প্রতিবার সুমনকে মামাবাড়িতে রেখে আসে। অনেকদিন তাদের বাড়িতে আছে. এখন একেবারে নিজের লোক হয়ে গেছে।

সুমন দেখল, তার সব জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই মা তাকে ডাকছেন. বুঝিয়ে দিচ্ছেন কখন কোন শার্ট-প্যান্ট পরতে হবে। বলছেন, সে যেন পুকুরে একা-একা চান করতে না যায়. ভাইবোনদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি না করে দাদু-দিদুর কথা শোনে।

সুমনের এবার রাগ হল। মা এখনও রাগ করে আছেন. একবারও তো তাকে 'তুই' বলছেন না। সুমন সে কথা বলতেই মা বললেন, "তোমার ওপর রাগ করে কী আর হবে? তুমি কি আমার কথা শুনলে? সেই মামাবাড়িই তো যাচ্ছ। একবারও ভাবলে না পুজোর সময় মা একা-একা থাকবে কী করে!"

রান্না করতে করতে রাধুদা ছুটে এল। "খাবার সময় আবার অত বকাবকি করছ কেন?" মা উত্তর দিলেন না. শুধু সুমনের স্যুটকেসটা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজোর দিন সুমন যখন মায়ের হাতের গোছানো স্যুটকেস খুলে নতুন জামা পরবে তখন যে তার মনটা খারাপ হয়ে যাবে, মা কি সে কথা জানেন না!

সুমনের মনে পড়ল, গ্রামের দুর্গাঠাকুরকে সে কথা দিয়ে এসেছে. "ঠাকুর আবার আমি আসব, তখন তুমি আমাকে চিনতে পারবে তো?" ঠাকুরকে কথা দিয়ে কথা না রাখলে তার পাপ হবে যে! শুধু দুর্গাঠাকুরকে নয়, গ্রামের মাঠ-ঘাট- বটগাছটিকে সে কথা দিয়ে এসেছে! তার কী হবে ?

এইরকম কথা দেওয়া সুমনের স্বভাব। এই তো এবার বোটানিকাল গার্ডেনে ওরা স্কুল থেকে সবাই পিকনিক করে এল। বিরাট-বিরাট বটগাছের নীচে বসে ওরা খাওয়াদাওয়া খেলাধুলো করছিল। ফেরার সময় সুমন গাছগুলোর নীচে দাঁড়িয়ে গাছগুলোর উদ্দেশে বলেছিল. "আমি আবার আসব তখন আমাকে চিনতে পারবে তো?"

সুমন ভাবে, আচ্ছা, অনেকদিন বাদে যদি যাই গাছগুলো কি আমাকে চিনতে পারবে?

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে খেলার মাঠের জন্যেও সুমনের কষ্ট হয়। খেলার মাঠটা সারা রাত একা-একা থাকে, ওর ভয় করে না? গভীর রাতে ভূতের ভয়! এসব কাউকেই সুমন বোঝাতে পারে না। একবার মামাতো ভাই তপুদাকে সে হঠাৎই এসব কথা বলে ফেলেছিল। শুনে তপুদার সে কি হাসি! "গাছের আবার ভয়! তাকে আবার কথা দেওয়া! পাগল নাকি তুই?"

সুমন ভাবছিল এবার পুজোর আনন্দটাই মাটি। মামাবাড়ি গেলে সব সময় মনে হবে মায়ের কথা—"সুমন থাকলি না তো। ভেবেছিলাম একসঙ্গে ঠাকুর দেখব।" আর কলকাতায় থাকলে সে গ্রামের সবার কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে। মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে দুর্গাঠাকুরের কাছে। ঠাকুর অবশ্য সব জায়গায় থাকেন বলে বুঝতে পারবেন, কেন সুমন গ্রামের পুজোয় যায়নি। কিন্তু ঘাট-মাঠ-পুকুর আর গাছেরা কিছুই জানতে পারবে না।

সুমন কী করবে বুঝতে পারছিল না। কী করবে সে? শেষকালে ও বাবার কাছে যাওয়াই ভাল মনে করল। "বাপি, তুমিও এবার গ্রামে চলো না! কোনওদিনই তো গ্রামের পুজো দেখলে না। এবার না হয় দেখলে।"

সুমনের বাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। "ছুটিটা এবার ওখানে কাটালে মন্দ কি?"

খুশিতে সুমনের ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করছিল। সে জানে, বাবা যখন রাজি হয়েছেন মাও ঠিক রাজি হবেন। এবার কথা রাখার চিন্তা থেকে তার রেহাই।

অন্যান্যবারের মতো এবারেও সে বুড়ো বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে. "আমাকে চিনতে পারছ তো? আমি তোমাদের সুমন, সুমন চক্রবর্তী। দেখেছ তো আমার কথার দাম কত। ঠিক কথা রেখেছি কিনা বলো?"

ছবি মদন সরকার

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
■	৬			৭	৮	■
৯		■	■	■	১০	
■	১১	১২	■	১৩		■
১৪	■	১৫			■	১৬
১৭			■	১৮		

সংকেত : পাশাপাশি : ১। হাতে পেলে শিশুদের মুখে হাসি ফোটে। ৩। টাকা-পয়সা কী হলে পর্বত হয় ? ৫। পাখি। ৬। উভচর প্রাণী ৭। যাঁর যজ্ঞে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল। ৯। যে-জন্তুর নামে গড্ডলিকা-প্রবাহ নামে একটি বাগ্-ধারার সৃষ্টি। ১০। সংখ্যা-বিশেষ। ১১। গাছের ঝুরি। ১৩। সাহসের অভাব। ১৫। খাদ। ১৭। কোন জন্তু খড়্গ বয়ে বেড়ায়? ১৮। বাল্মীকি আগে যা ছিলেন।

উপর-নীচ : ১। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ। ২। জাহাজ-চালক। ৩। রামায়ণের কোন বানর বাহুর অলংকার ? ৪। পায়রা-বিশেষ। ৬। ওষুধ। ৮। হিন্দুদের মধ্যে যারা দেশ শাসন করত। ১২। সাদা ফুল বিশেষ। ১৩। দশরথপুত্রের নামে কোন্ পাখি? ১৪। পাখি। ১৬। মুসলমান সাধু।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

স	ঙ্গি	ন	■	তে	লু	গু
রো	■	ন্দি	■	জ	■	রু
জি	ত	■	■	■	বা	স
নী	র	ব	■	গো	ষ্প	দ
না	■	■	■	■	■	য়
ই	■	হু	■	ফে	■	দ
ডু	বু	রি	■	উ	দা	ত্ত

ধাঁধা

আমাদের বাড়ির সামনের ব্যাঙ্কটা দেখতে-দেখতে বেশ ছড়িয়ে গেল। কত নতুন কাউন্টার, নতুন নতুন মুখ, বন্দুক-কাঁধে দারোয়ান। রোজই কিছু-না-কিছু পালটাচ্ছে।

ছোট্‌কা তো একবারে প্রথম দিকে গিয়েই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে এসেছিল। কদিন ধরে দেখি ছোড়দিকে খুব বোঝাচ্ছে। ছোড়দির নামে একটা অ্যাকাউন্ট নাকি খোলা উচিত। আসলে ছোড়দি কিছু-কিছু টাকা আলাদা করে রেখে বেশ

জমিয়ে ফেলেছে। আগে স্কলারশিপের টাকাটা হাতে পেয়ে মার আলমারিতে আলাদা খামে রেখে দিত। এখন তো দুজন-মেয়ে বাড়িতে এসে পড়ে ওর কাছে। সেই টাকাটাও পুরো খরচ হয় না ছোড়দির। আমাকে অবশ্য দু-চার টাকা দেয় মাঝে মাঝে।

তা, ছোড়দি শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে এল। ছোটকাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। ছোড়দির পাসবইটা খুব সুন্দর একটা প্লাস্টিকের কভারে মোড়া। আমি দেখতে গেছি, ছোটকা হঠাৎ বলল, "না না সতুবাবু এখন নয়। অ্যাকাউন্ট নাম্বার নিয়ে আগে একটা ধাঁধার উত্তর দাও, তারপর দেখবে পাসবইটা।"

অ্যাকাউন্ট নম্বরেও ধাঁধা। আমি চমকে যাই। ছোটকা তখন ভেঙে যা বলল, তা রীতিমত ইন্টারেস্টিং। সত্যিই আশ্চর্য ঘটন ধাঁধা হিসেবে কেমন সেটা তোমরাই বলবে।

ব্যাপার হল কী, ছোড়দির অ্যাকাউন্ট নম্বরটা ছোটকার অ্যাকাউন্ট নম্বরকে একেবারে উলটো করে বসানো। দুটোই চার অঙ্কের। ছোটকার দু হাজার দিয়ে শুরু, ছোড়দির নম্বর আট হাজারের ঘরে। ছোটকার নম্বরটাকে উলটো করলে যেমন ছোড়দির অ্যাকাউন্ট নম্বর মিলে যায় তেমনই আর-একটা মজার ব্যাপার রয়েছে দুটো অ্যাকাউন্ট নম্বরের মধ্যে। ছোটকার অ্যাকাউন্ট নম্বর হল ছোড়দির অ্যাকাউন্ট নম্বরের ঠিক চার ভাগের এক ভাগ।

এমন মিল খুব অদ্ভুত ঘটনা নয় ? বাড়িসুদ্ধ সবাই শুনে অবাক। কিন্তু অ্যাকাউন্ট নম্বর দুটো কী কী তা আমি এখনো জানি না। যা বলা হল, তার থেকেই বার করা নাকি যায়। ছোটকা তো তাই বলল।

আমি চেষ্টা করছি, তোমরাও করো। এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা : রুনুর কাছে কিছু পুঁতি, ঝুনুর কাছেও তাই। দুজনের একই সংখ্যার পুঁতি। দশের বেশি পঞ্চাশের কম—একেক-জনের পুঁতি। রুনু ৬টা করে পুঁতি দিয়ে পুতুলের মালা বানাল। একটা পুঁতি থেকে গেল। ঝুনু পাঁচটা করে পুঁতি দিয়ে পুতুলের মালা গাঁথল। দুটো পুঁতি থেকে গেল।

কটা করে পুঁতি ছিল দুজনের ?

তৃতীয় ধাঁধা : পরবর্তী সংখ্যা কত ?

৯৮, ৯৩, ৮৮, ৮৩,?

চতুর্থ ধাঁধা : উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

৭৭ (২০১) ৩

৫৪ (?) ৫

গতবারের উত্তর : ১। ২৬টি মুরগি ১৭টি গোরু। ২। ২৭। ৩। ৮৩। ৪। ফটিকচাঁদ—অন্য-গুলি ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

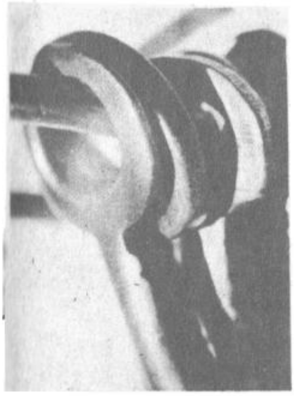

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কেটলির নলের মুখের ফোটো   ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্র: সুতো ঝোলাবার জন্যে একটা ঢিল দরকার, কোথায় পাই বলুন তো?

উ: দেখ কোথায় দুটো পাখি মরে আছে, কাছাকাছি একটা ঢিল পেয়ে যাবে।

প্র: 'নিমরাজি' হওয়া মানে কী?

উ: তেতোমুখে যখন কিছুতে রাজি হতে হয়।

প্র: মাথা মাটিতে রেখে পা-দুটো সোজা তুলে দিয়ে একটা যোগব্যায়াম আছে, কী নাম বলুন তো ব্যায়ামটার?

উ: বোধহয় 'শিরদাঁড়া'!

প্র: নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হলে কী করা দরকার?

উ: দুটো কানই কেটে ফেলতে হয়।

প্র: বাংলা ব্যাকরণে ধাতুরূপ কাকে বলে?

উ: ব্যাকরণের যে চ্যাপ্টারগুলো খুব শক্ত তার সবগুলোই বোধহয় ধাতুরূপ।

সুসেন

মজার খেলা

এই খেলাটা খেলতে গেলে চাই কিছু কাগজ আর কিছু পেনসিল। রংপেনসিল হলে তো আরো ভাল।

বন্ধুদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাগজ দিয়ে দাও। কাগজটার তলায় রাখার জন্যে পুরু কোনো বই বা খাতাও নিতে পারে তারা। আর হাতের কাছাকাছি থাকবে পেনসিল বা রংপেনসিলের বাক্স।

ঘরের আলোটা নিবিয়ে দাও। এবার তুমি পরপর যেমন বলবে, কাগজের উপর তেমন ছবি আঁকতে হবে তাদের। সবটাই হবে অন্ধকারে কিন্তু।

তুমি খুব সহজ ছবি আঁকতে বলবে। যেমন ধরো, প্রথমে বললে,

একটা নদী আঁকো। আঁকল তারা। এবার বলো, জলের ওপর একটা নৌকো আঁকো। এবার, নৌকোর ওপর মাঝি আর বৈঠা। তারপর বলো, নদীতীরে কিছু গাছ, বাড়ি আঁকতে। সূর্য বা চাঁদও আঁকতে বলতে পারো। আকাশে মেঘ আঁকলেই বা ক্ষতি কী।

যাই হোক, তোমার কথামতো অন্ধকারে ছবি আঁকা যখন শেষ হবে, তখন ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে সকলের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে নাও। তারপর সবাই মিলে দ্যাখো। দেখবে কী অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি ফুটেছে এক-একজনের কাগজে।

হাসিখুশি

একটি লোক ফুটপাথের দোকানে চা খেয়ে কাচের গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। খানখান হয়ে ভেঙে গেল সেটা। দোকানি চায়ের সঙ্গে গেলাসের দাম দাবি করায় লোকটি বলল, "ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়—আমি কি আর ইচ্ছে করে ফেলেছি? অন্যমনস্কভাবে ওটাকে মাটির ভাঁড় ভেবেছিলাম।"

পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে একটি লোক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেল। ঘটনা শোনার পর ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "নাম কী?"

লোকটি বলল, "তা তো জানি না বাবু।"

ডাক্তার ধমক লাগালেন, "চালাকি পেয়েছ, নিজের নাম জানো না!"

লোকটি একগাল হেসে বলল, "তাই বলেন! আমি ভাবলাম কুকুরের নাম জিজ্ঞেসা করতিছেন।"

বাবা : তোর বাঁ কানটা দিন-দিন বড় হয়ে যাচ্ছে কেন রে! এটা নিশ্চয়ই একটা রোগ—কোনো ই-এন-টি স্পেশালিস্টকে দেখানো দরকার।

ছেলে : ও কিছু নয় বাবা, তুমি বরং মাস্টারমশাইকে বলে দিয়ো এখন থেকে তিনি যেন আমার ডান কানটা মলেন—তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

ছবি অহিভূষণ মালিক

ঘামাচির চুলকানি
আর জ্বালাযন্ত্রনা
ভুলে যান!
নাইসিল
ব্যবহার করুন!
সবচেয়ে দ্রুত
আরামদায়ক ঘামাচি
নাশক পাউডার
২ রকমের
প্যাকে পাওয়া
যায়—'ব্লু' আর
'স্যাণ্ডেল উড'।
নাইসিল আনুন
ঘামাচি ভুলুন
মাত্র টা.৬·৬৩প.*
* সর্বাধিক খুচরো দাম।
স্থানীয় কর আলাদা।
Glaxo
nycil
PRICKLY HEAT POWDER
GN-79-364-Ben

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে ঃ কাকাবাবু আর সন্তু এবার অভিযানে এসেছে হিমালয় পাহাড়ে, এভারেস্ট চূড়ার দিকে। কিছু দূর এগোবার পর শেরপা ও মালবাহকেরা ইয়েতির মতন একটা বিশাল কোনো জানোয়ার দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। শুধু মিংমা নামে একজন শেরপা ফিরে আসে। কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠালে হেলিকপটারে চেপে দুজন মিলিটারির অফিসারও আসেন সাহায্য করতে। সেই ছোট দলটি ইয়েতির সন্ধানে এগোলে হঠাৎ এক সময় কাকাবাবু পেছনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। জ্ঞান হবার পর কাকাবাবু দেখলেন তিনি রয়েছেন মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গের মতন জায়গায়। সেখানে হলুদ মুখোশ পরা কিছু লোক টানতে-টানতে তাঁকে নিয়ে গেল দলপতির কাছে। দলপতির সামনে একটা পাথরের টেবিলের ওপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে সন্তু। সন্তুর চোখের পাতা একবার নড়ে উঠতেই মুখোশধারীরা তাকে ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশান দিতে গেল। কাকাবাবু 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর—

॥ ২২ ॥

সন্তু যেন একটা অন্ধকার সমুদ্রে ভাসছিল। একবার চোখ মেলেও সে কিছু দেখতে পেল না। বুঝতেও পারল না সে কোথায় আছে। মাথার ভেতরটা খুব ক্লান্ত, তার ইচ্ছে করল ঘুমিয়ে পড়তে।

হঠাৎ যেন কিছু চ্যাঁচামেচির শব্দ এল তার কানে। তার মধ্যে কাকাবাবুর গলা। অমনি একটা ঝাঁকুনি লাগল তার সারা শরীরে। সে পাশ ফিরে তাকাল।

প্রথমে তার মনে হল ভূত। কয়েকটা ভূত কাকাবাবুকে চেপে ধরেছে। তারপরেই বুঝতে পারল, ভূত-টুত কিছু নয়, কয়েকজন মুখোশ-পরা মানুষ।

সন্তু উঠে বসতে গেল। তার আগেই দু'জন মুখোশধারী চেপে ধরল তাকে। তাদের একজনের হাতে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ।

বন্দী অবস্থায় কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, পালা! যেমন করে হোক পালা!"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই কিছু চিন্তা না করেই পা তুলে একজন মুখোশধারীর পেটে কষাল খুব জোরে এক লাথি। তাতে তার হাত থেকে কাচের সিরিঞ্জটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

কেইন শিপটন রেগে বলে উঠল, "ক্রামজি ফুল! শিগগির আর একটা নিয়ে এসো!"

কেইন শিপটন নিজে উঠে এগিয়ে আসবার আগেই সন্তু টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপরই অন্ধের মতন দৌড়ল।

কাকাবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, "সন্তু, পালা পা...।" তক্ষুনি তাঁর মুখ চাপা দিয়ে দিল কেউ।

সন্তু দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখল সামনেই একটা লোহার রেলিং। মুখোশধারীরা তাকে তাড়া করে আসছে বুঝতে পেরে সে সেই রেলিং ধরে ভল্ট খেয়ে চলে গেল অন্যদিকে। সেইভাবে ঝুলতে-ঝুলতে তাকিয়ে দেখল, প্রায় একতলার সমান নীচে অনেক মেশিন-টেশিন রয়েছে। মুখোশধারীরা তাকে ধরে ফেলবার আগেই সে হাত ছেড়ে দিল, ধপাস করে পড়ল নীচে।

সন্তুকে পালাতে দেখে কেইন শিপটন কাকাবাবুর কোটের কলার ধরে টানতে-টানতে এনে শুইয়ে দিল পাথরের টেবিলটার ওপর। তারপর রিভলভারের মতন দেখতে, কিন্তু সাধারণ রিভলভারের চেয়ে বেশ বড় একটা অস্ত্র তুলে বলল, "তুমি ঐ ছেলেটিকে এক্ষুনি ফিরে আসতে বলো। নইলে তুমি মরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "না! সন্তু, ফিরে আসিস না!"

কেইন শিপটন বলল, "আমি ঠিক দশ গুনব! তার মধ্যে ফিরে আসতে বলো ঐ ছেলেটাকে। ওয়ান, টু..."

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই কিছুতেই ধরা দিবি না!"

কেইন শিপটন বলল, "থ্রী, ফোর..."

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? তুমি তা হলে আমাকে কিছুই চেনো না, কেইন শিপটন। তুমি আমায় মারতে পারো, কিন্তু তুমি কিছুতেই এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না!"

কেইন শিপটন বলল, "ফাইভ, সিক্স..."

কাকাবাবু গলা চড়িয়ে বললেন, "সন্তু কিছুতেই আসবে না। তুমি যতই ভয় দেখাও..."

সন্তু নীচে লাফিয়ে পড়ে প্রথমটায় ঝোঁক সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। তাতে অদৃশ্য কোনো কিছুতে ঠোকা লেগে গেল তার মাথায়। তারপরই সে বুঝতে পারল, মাঝখানের জায়গাটা শক্ত কাচ দিয়ে ঘেরা, সেই কাচে সে ধাক্কা খেয়েছে। কাচের দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো বড়-বড় যন্ত্র, সেগুলি থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে।

পায়ে খানিকটা ব্যথা লেগেছে সন্তুর, কিন্তু এমন কিছু না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল, গোল জায়গাটার চারদিকে চারটি সুড়ঙ্গ রয়েছে, সুড়ঙ্গগুলো অনেক লম্বা, শেষ পর্যন্ত দেখাই যায় না। এদিকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে কয়েকজন মুখোশধারী তাকে ধরবার জন্য।

সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পালাতে গিয়েও শুনতে পেল কেইন শিপটনের কথাগুলো আর কাকাবাবুর উত্তর। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কেইন শিপটন 'নাইন' গোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে বলল, "ডোনট কিল মাই আংকল। আই অ্যাম কামিং!"

ঘোরানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মুখোশ-ধারী দুটির দিকেও হাত তুলে সে বলল, "আই অ্যাম কামিং!"

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "না, আসিস না, সন্তু। আমাদের দু'জনকেই এরা মারবে। দু'জনে এক সঙ্গে মরে লাভ নেই!"

সন্তু সে-কথা গ্রাহ্য করল না। কাকাবাবুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সে কিছুতেই পালাতে পারবে না। সে আবার চেঁচিয়ে বলল, "ইয়েস, আই অ্যাম কামিং!"

এক পা এক পা করে এগোতে লাগল সে। মুখোশধারী দু'জন তাকে ধরবার জন্য অপেক্ষা করছে। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে সন্তুর বুকের মধ্যে। এরা কারা? এরা কি সত্যিই তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে!

এগোতে এগোতে সন্তু দেখল, এক জায়গায় দেয়ালে ইলেকট্রিকের মিটারের মতন অনেকগুলো জিনিস। আর একটা লম্বা লিভার অর্থাৎ লোহার হাতলের মতন জিনিস সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। সেটা বেশ খানিকটা উঁচুতে।

বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। সে লাফিয়ে সেই লিভারটা ধরেই ঝুলে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল!

তারপর নানারকম চ্যাঁচামেচি আর হৈ-চৈ। ওপর থেকে কেইন শিপটন কড়া গলায় কী যেন হুকুম দিলেন। মুখোশধারী দু'জন অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজে ছুটে এল সন্তুকে ধরবার জন্য।

লিভারটা ধরে ঝুলে দোল খেতে খেতে সন্তু সামনের দিকে লাথি চালাতেই তার জোড়া পায়ের লাথি লাগল একজনের বুকে। সেই লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একজনের গায়ে। পেছনের লোকটা সেই ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে আন্দাজে গুলি চালাল সন্তুর দিকে।

ততক্ষণে সন্তু লিভারটা ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে পড়েছে। গুলিটা লাগল লোহার লিভারটাতে, সেটা ভেঙে ছিটকে উড়ে গেল। আর আলো জ্বলবার কোনো উপায়ই রইল না।

কেইন লিপটন চিৎকার করতে লাগল, "বোকার দল! ছেলেটাকে কেউ ধরতে পারলে না? শিগগির আলো জ্বালো, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে! আমরা দম বন্ধ হয়ে মরব!"

অন্ধকারে জড়াজড়ি করে সবাই ছুটে এল আলোর সুইচ-বোর্ডের দিকে। সন্তু একবার ভাবল, ওপরে কাকাবাবুর কাছে যাবে। কিন্তু আবার ভাবল, সিঁড়ি দিয়ে অনেকে নামছে। ওদিকে যেতে গেলে সে ধরা পড়ে যাবে। দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সে উল্টো দিকে সরে যেতে লাগল। তারপর এক জায়গায় দেয়াল নেই টের পেয়ে বুঝল, এদিকে একটা সুড়ঙ্গ। সে ছুটল সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। খানিকটা গিয়েই একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, তারপর আবার উঠে ছুটল।

কেইন শিপটন নিজেই নেমে এসেছে সুইচ বোর্ডের কাছে। সবাইকে গালাগালি দিতে দিতে বলল, "ইডিয়েটের দল, একটা সামান্য বাচ্চা ছেলেকে ধরতে পারে না...টর্চ দাও, কার কাছে টর্চ আছে—"

কারুর কাছেই টর্চ নেই, একজন একটা

সিগারেটের লাইটার জ্বালল। সেই সামান্য আলোয় দেখা গেল, সুইচ বোর্ডের একদিক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ওদিকে কাকাবাবু যখন বুঝলেন তাঁর কাছাকাছি আর কেউ নেই, তিনি আস্তে আস্তে টেবিলটা থেকে নামলেন। তাঁর পক্ষে ছুটে পালানো সম্ভব নয়। এই অন্ধকারের মধ্যে তো আরও অসম্ভব। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। আগেই তিনি দেখেছিলেন যে, কেইন শিপটন যে-চেয়ারটায় বসেছিল, তার পেছনে একটা লোহার দরজা আছে। প্রথমে দিক ঠিক করে নিয়ে তিনি একটু-একটু করে এগোলেন সেই দরজাটার দিকে। এক সময় হাতের ছোঁয়াতেই দেয়ালের বদলে লোহা টের পেলেন।

দরজাটা খোলাই ছিল, একটু জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কাকাবাবু ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আবার। চারদিকে হাত বুলিয়ে দেখলেন, দরজাটা বেশ মজবুত। ছিটকিনিও রয়েছে। ভেতর থেকে সেটাকে আটকে দিলেন শক্ত করে।

তারপর ঘরের মধ্যে ভাল করে তাকাতেই তিনি চমকে উঠলেন খুব।

একটু দূরে একটা টাকার সাইজের গোল লাল আলো খুব উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে। সেই আলোটা দেখলেই ভয় হয়। মনে হয় যেন কোনো একচক্ষু দানব দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে।

কাকাবাবু বুঝলেন, ওটা কোনো যন্ত্র। কিন্তু সব দিক একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার মধ্যে এই যন্ত্রের লাল আলোটা জ্বলছে কী করে? নিশ্চয়ই ওটার জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবু যন্ত্রটার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ল, কেইন শিপটন একবার বলেছিল, এখানে এমন যন্ত্র আছে, যাতে হাত ছোঁয়ালেই মৃত্যু অনিবার্য। এটা সে-রকম কোনো যন্ত্র নয় তো?

কাকাবাবু কান পেতে শুনলেন, যন্ত্রটার মধ্য থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। তিনি আর যন্ত্রটার দিকে এগোলেন না। লাল আলোটা এমন তীব্র যে, ওদিকে চেয়ে থাকাও যায় না। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে তিনি আস্তে-আস্তে বসে পড়লেন। পাশে হাত রাখতেই আবার চমকে উঠলেন তিনি। একটা কোনো লোমশ জিনিসে তাঁর হাত লাগল। অমনি নড়ে উঠল সেই জিনিসটা, তারপরই ডেকে উঠল।

এটা সেই কুকুরটা। এই ঘরের মধ্যে এসে ঘুমিয়ে ছিল, কাকাবাবুর ছোঁয়া লাগতেই আবার জেগে উঠেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে এই দুষ্টু কুকুরটাকে নিয়ে কাকাবাবু আবার এক মহা মুশকিলে পড়লেন। কুকুরটা দেখতে ভারী সুন্দর, আকারেও বেশি বড় নয়, কিন্তু ঘেউ-ঘেউ করে সে তেড়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর ওপরে ওর রাগও আছে। কাকাবাবু প্রথম দু'একবার কুকুরটার কামড় খেলেন। তারপর বেশি সাহস পেয়ে কুকুরটা তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি খপ করে সেটাকে ধরে ফেললেন দু'হাতে। কুকুরটা ছটফট করেও আর নিজেকে ছাড়াতে পারল না। কাকাবাবু এক হাতে কুকুরটার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে।

নীচের তলায় সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এক জায়গায় ধাক্কা খেল। গুহাটা সেখানেই শেষ। আবার পেছন ফিরতে গিয়েই তার মনে হল, দূরে কিছু লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এদিকেই আসছে?

কোণঠাসা ইঁদুরের মতন সন্তু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

তারপরেই আলো জ্বলে উঠল। কেইন শিপটন এর মধ্যে আলোর সুইচ ঠিক করে ফেলেছে।

সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গের মুখে দু-তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে লম্বা পিস্তল। আর দেখল, তার ঠিক সামনেই আর-একটা ছোট সুড়ঙ্গের পথ। সেটায় ঢুকতে গেলে সামনে একটুখানি দৌড়ে যেতে হবে, তাতে দূরের মুখোশধারীরা তাকে দেখে ফেলতে পারে। সেটুকু ঝুঁকি নিয়েই সন্তু এক দৌড়ে সেই সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে গেল। (ক্রমশ)

CAS/NC/41/80 BEN

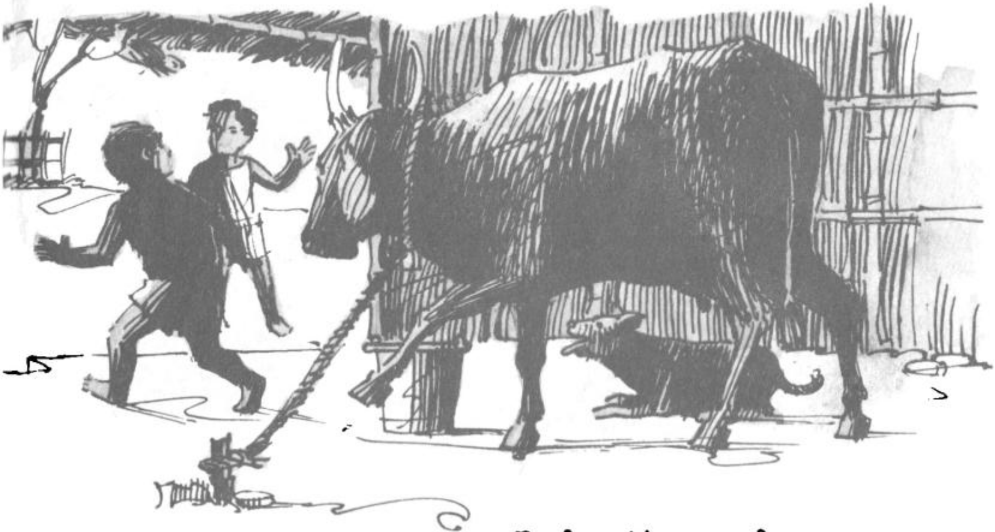

লক্ষ্মী ছেলে

সমর মিত্র

গোয়ালঘরের ওপাশ থেকে ব্যা করে বাছুরটা চেঁচিয়ে উঠল। সুরভীর পাঁচমাসের দুরন্ত বক্না। তিড়িং বিড়িং লাফায়। পাগলের মতো ছোটাছুটি করে। কিন্তু ডাকে কেন? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। দুধ খেতে চায়। সুরভীও ডাক দিল দুবার—হাম্বা হাম্বা।

মনিবগিন্নি বক্নাটার নাম দিয়েছে সোনা। মনিবের ছেলে কালু আদর করে ডাকে সুনু বলে। ছেলেটা কিন্তু দারুণ দস্যি। তুলি করবে বলে সুরভীর ল্যাজের চুল সব কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়েছে। অমন সুন্দর বাহারি লেজ কী বিচ্ছিরি না হয়ে গেল। হায়, হায়! ল্যাজের দুঃখে সুরভীর চোখ থেকে টপ টপ করে চার ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

শুধু কি তাই? কদিন আগে বাড়ির কুকুর টাইগারের লেজে দড়ি দিয়ে টিন বেঁধে দিয়েছিল। টাইগার যত ছোটাছুটি করে, টিনটারও তত ঢংঢং শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার যত পাজি ছেলের দল জুটে গেল। ভাগ্যিস মনিব বাড়িতে ছিল সেদিন। চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে মনিবই সেদিন টাইগারকে টিনের ঢংঢং আর ছেলেদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিল। টাইগার সুরভীর বন্ধু। দুজনের কত মনের কথা হয়। টাইগার কোন্ বাড়িতে কী খেল তার হিসেব দেয়। আর সুরভী ওকে বানিয়ে বানিয়ে কত গপ্প শোনায়। টাইগার সুরভীকে বলে সুরভীদি।

কিন্তু কই? সোনাটা তো এল না। সুরভী আবার হাম্বা হাম্বা করে দুবার ডাক দিল। সোনা এল না, এল মনিবের ছেলে কালু। দাঁত বার করে হাসছে দ্যাখো না! দুর দুর, দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। সুরভী গোয়ালের মটকার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সোনা কই? আবার সুরভী ডাক দেয় হাম্বা। গোয়ালের দোরগোড়া থেকে উত্তর আসে—ব্যা। কিন্তু কই? ও তো কালু! দাঁত বার করে হাসছে আবার! সুরভী আর একবার ডাকে। ওমা এ কী কাণ্ড! এ যে দেখি কালুই ডাকে—ব্যা! প্রথমটা সুরভী খুব অবাক হল—কী খলিফা ছেলে রে বাবা! তারপর সে ভীষণ রেগে গেল—কী পাজি ছেলে! দেব মাথায় দুই চাঁটি। ভ্যাংচানো বার করে দেব। বিচ্ছু ছেলে কোথাকার! কিন্তু কী আর করে? সুরভী কটমট করে তাকিয়ে থাকে কালুর দিকে।

কালু বলে, "কী রে, অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? জলতেষ্টা পেয়েছে? জল দেব?"

কালু সুরভীর কাছে চলে আসে। জলের বালতিটা এগিয়ে দেয়।

সুরভী জলের বালতিতে মুখ দেয়। শোঁ শোঁ করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেয়। নাঃ, জলতেষ্টাও পেয়েছিল বই-কী!

কালুকে ওর বন্ধু মাধাই ডাকে। কালু 'যাই' বলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যাবার আগে সুরভীর মাথায় চাঁটি মারতে ভোলে না। অসভ্য বাঁদর ছেলে কোথাকার! সুরভী রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

সোনা কোথা থেকে দৌড়ে ছুটে এল মায়ের কাছে। সুরভী বলল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলি হতচ্ছাড়ি?" "বাঁশবনে"—বলে আবার ছুট দিল সোনা। সুরভী বলল, "ওরে যাসনি, শোন।" আর শোন! সোনা তখন এক দৌড়ে একেবারে দত্তদের বাগানে।

সুরভী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধরনই অমন। হাঁফাতে হাঁফাতে কোথা থেকে হাজির হয় টাইগার। সুরভীর পাশে ঠাণ্ডা জায়গাটায় বসে হাঁফাতে থাকে। সুরভীর মুখ গম্ভীর। টাইগার বলে, "কী হল সুরভীদি?"

সুরভীদি বলল, "ওই যে বিচ্ছু ছেলেটা—সোনার গলা নকল করে বলে কিনা—ব্যা? আমার সঙ্গে রসিকতা?"

টাইগার বলে, "হ্যাঁ সুরভীদি, ও আমার গলা নকল করেও ডাকে। আমি তো সেদিন অন্য কুকুর মনে করে তেড়ে বেরিয়ে এসেই দেখি মনিবপুত্তুর। ও মা, সে কী লজ্জা!"

সুরভী বলে, "আমি অত সহজে ছাড়ছি না। আমার মা ছিল ভাগলপুরের ডাকসাইটে শিংবাহার বংশের মেয়ে। আমার মাথাতেও সেই শিং।"

"কী করবে তুমি সুরভীদি?"

"আমিও ওকে ভ্যাংচাব। মানুষের মতো গলা করে আমিও বলব ইস্টুপিড, ননসেন। যেমন মনিব ওকে বলে। লাথি দেখাব।"

সুরভী হাম্বা হাম্বা করে ইস্টুপিড, ননসেন বলার চেষ্টা করে। সামনের একটা পা ছুঁড়ে লাথি দেখায়। তারপর টাইগারকে বলে, "কী রে, হল তো?"

টাইগার বলে, "হ্যাঁ দিদি, সুন্দর হয়েছে। এবার খুব জব্দ হবে ব্যাটা।"

এমন সময় কোথা থেকে আবার কালু এসে হাজির। কালু ঘরে ঢোকামাত্র সুরভী হাম্বা হাম্বা করে বলল, "ইস্টুপিড, ননসেন!" তারপর কালুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কালু বলল, "কী বলছিস, খিদে পেয়েছে? খেতে দেব?"

সুরভী দ্বিগুণ রেগে ওর দিকে সামনের একটা পা ছোঁড়ে।

কালু বলে "ঠ্যাং ছুঁড়ছিস কেন? মশা কামড়াচ্ছে? আজ ঠিক সন্ধেবেলা ধুনো দিয়ে দেব।"

কালু সুরভীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। সুরভী কালুর বুকে মাথা ঘষে। ওর চোখ বুজে যায়।

হঠাৎ কালুর নজর পড়ে টাইগারের দিকে। বলে, "আরে, তুই এখানে কী করছিস?"

ওর কানটা ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে কালু বেরিয়ে যায় খড়কুচি আনতে। টাইগার কেঁউ কেঁউ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

সুরভী বলে, "কাঁদিস কেন? ওটা তো ওর আদর। নাঃ, কালুদাদা আমাদের লক্ষ্মী ছেলে!"

টাইগারও তা মেনে নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে নাক ডাকাতে থাকে।

ছবি মদন সরকার

বড়দিনের সময় তখন প্রচণ্ড শীত। জমিদারবাবুর প্রাসাদে এক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই দারুণ ধনী, কোটিপতি। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেছেন জমিদারবাবু। ধনী অতিথিরা দেখে, এই শীতেও শরৎ পণ্ডিতের গায়ে একখানা সুতির চাদর, খালি পা, কোঁচার কাপড় বেড় দিয়ে কোমরে বাঁধা। কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত! বসতেও বলল না তাঁকে কেউ। একজন জিজ্ঞেস করল, "আপনার বুঝি শীত করে না?" সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁক থেকে একটি পয়সা বার করে ভদ্রলোকের মুখের সামনে ধরে দাদাঠাকুর বললেন, "আজ্ঞে পয়সার গরম বড় গরম, তাই একটি করে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে রাখি।"

ফুলের জলসায়

আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা বিধান সভার বাগানে ফুলের জলসায় গিয়েছিলাম।

গেট দিয়ে ঢুকেই দেখি কত ফুল। আমার মনে হচ্ছিল, সব ফুল নিয়ে বাড়ি চলে আসি। আমার এত আনন্দ হচ্ছিল যে, বুঝতেই পারছিলাম না, কোনটা আগে দেখি। সব ফুল দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন স্বপ্নের রাজ্যে চলে গেছি।

চন্দ্রমল্লিকা গাঁদা গোলাপ ডালিয়া ও অনেকরকম ফুল। ছোট্ট-ছোট্ট টবে বট, অশ্বত্থ, শিমুল আর কমলালেবু গাছ। বেশ মজা লাগল দেখে। ওইটুকু ছোট্ট গাছে পাকা-পাকা কমলালেবু ঝুলছিল। শুধু ফুল-ফলই নয়, নানারকমের ক্যাকটাসও ছিল। একটি ক্যাকটাস ছিল অদ্ভুত ধরনের। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন একটা মাটির বল টবের ওপর বসিয়ে রেখে গেছে। আর একটি ক্যাকটাস লাঠির মতো ওপরে উঠে গেছে। তার মাথায় একটা লাল ফুল।

ফুলের জলসা ছেড়ে চলে আসতে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ভাস্বতী কুমার (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **মৌলিনাথ দাস** (বয়স ৮)

টিয়াপাখি

টিয়া পাখি টিয়া পাখি,
করছ কেন ডাকাডাকি?
তোমার ওই সবুজ রঙ,
আমায় দাও মাখি বরং।

সুস্মিতকুমার বসু (বয়স ৭)

পালকি চলে

পালকি চলে সূর্য ডোবে
সন্ধ্যা হতে হ্যাজাক জ্বলে
রাস্তা তখন ধুধু করে
শেয়াল ঝিঁঝি ডাকছে জোরে
পালকি চলে দূরের গ্রামে
বৃষ্টি পড়ে টপটপিয়ে
ব্যাঙের ডাকে আকাশ ফাটে
পালকি এসে থামল মাঠে
ভাঙা বাড়ির সামনে এসে
রাত্রি গেল সেইখানেতে
ভোরের বেলায় পালকি চলে
সূর্য আবার উঠল জেগে
পালকি এসে থামল মাঠে

কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **অরণ্য চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ১০)

কান-কাটা মামা

চিকুমামাকে কেউ চেনো কি? সে খুব সাহসের গল্প বলত। একদিন পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে চিকুমামা বল খেলছিল। হঠাৎ বলটা হাত ফসকে গোলাপ গাছের তলায় চলে গেল। যেই চিকুমামা বলটা কুড়োতে গেছে, গোলাপ গাছের কাঁটায় তার কান একটুখানি ছ'ড়ে গেল। ভয় পেয়ে মামা কানে চুন লাগিয়ে বসেছিল। তার দিদি এসে বলল, "কী রে চিকু, কী হয়েছে?" সে এত ভয় পেয়েছিল যে কোনো উত্তর দিতে পারল না। সেইদিন থেকে চিকুমামাকে আমরা কান-কাটা মামা বলি।

টুপুর মুখোপাধ্যায় (বয়স ৬)

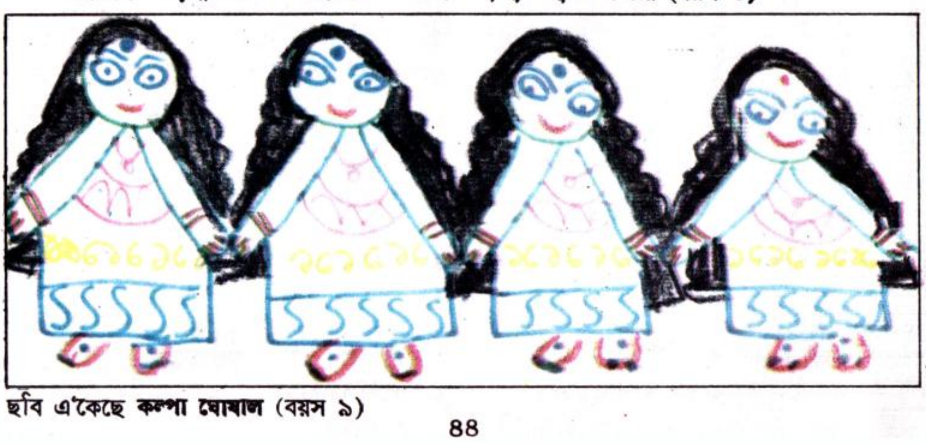

ছবি এঁকেছে **কল্পা ঘোষাল** (বয়স ৯)

নতুন রাজা

(ওকিনাওয়া দেশের গল্প)

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিয়ক্যু দ্বীপের মালার মধ্যে লকেটের মতো জ্বলজ্বলে দ্বীপটা হল ওকিনাওয়া দ্বীপ। সেই ওকিনাওয়া দ্বীপের শহর, নাহা শহর। শহর পার হয়ে শহরতলিরও শেষ সীমানার প্রান্তে ভাঙাচোরা ঘরে থাকে মা আর ছেলে। মায়ের খুব অসুখ। সাত বছরের ছেলে, সে কি বোঝে অসুখ মানে কী? মা তাকে ডাক দিয়ে বলল, "জানিস রে, আমি আর বাঁচব না।"

"কেন মা?"

"সে তুই বুঝবিনে। তবে শোন, মাচার ওপর বাঁধা রয়েছে তিন আঁটি মোচি ধানের খড়। তোর জন্যে রইল।"

"থাক মা।"

"থাক নয়, শোন। এ ছাড়া তোর জন্যে আর কিছু রইল না বাবা।"

"থাক মা, থাক।"

"থাক নয়। আমি মরলে সাত দিন কাটিয়ে খড়ের আঁটি নিয়ে যাবি ক্ষীরের দোকানে। দোকানির কাছে খড় বদলে কিনিস ক্ষীর।"

"থাক না, মা।" ছেলে কাঁদতে বসল।

ছেলেকে কাঁদতে দেখে উঠে বসল মা, হাত রাখল ছেলের মাথায়। "দেখ কান্ড। অত বড় ছেলে, বসল কাঁদতে। শোন রে শোন, ও তোর আপন ঘরের জিনিস। তোর বাবার বাড়ির—"

ছেলে চাইল অবাক চোখে।

"শোন তবে। যখন ছিলাম রাজার ঘরের রানী, একদিন রাজার সাথে গেছি সাগরপাড়ের পত্তনে। হাজার মানুষ দরদর ঘেমে খাটছে নিঃশব্দে—তোরণ-বুরুজটুরুজ বাঁধা নতুন জাহাজঘাটা বানাতে। পেছনে তাদের মিশে রয়েছে আকাশ আর পুবসাগরের ঝিলিমিলি, ঠিক যেন নীলার প্রলেপ দেওয়া ছবিটির মতন। দূরে থেকে তরতর করে সাঁতরে আসছে চুড়ো-বাঁধা পেটফুলোনো রামধনুকের চমক-বুটি পরা ইয়া এক পাখি—পাখি, না পরী-মাছ? দেখ দেখ কত বড় ময়ূরপঙ্খি আসছে আমাদের ঘাটে।— আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছি যেই, হাজার লোকে আচমকা কাজ ফেলে ফিরে তাকাল সাগর - দিগন্তে। আর রাজা তাকালেন তাদের দিকে। কতই বা বয়স তখন আমার। রাজা বললেন, এতগুলো লোকের কাজের মন ভেঙে দিলে অকারণ, অবুদ্ধি অলক্ষ্মী তুমি।

"সেই দিনই নির্বাসন হল আমার রাজ-পুরী থেকে। কেউ রদ করতে পারলে না রাজার দণ্ড। রাজার বাবা, তোর দাদু, লুকিয়ে-চুরিয়ে চোখের জল ফেলে আমার পুঁটুলিতে বেঁধে দিয়ে গেলেন তিন আঁটি মোচি ধানের খড়। থাক অসময়ের জন্যে। এতদিন ধরে পুতু-পুতু করে রেখে দিয়েছি তোর দাদুর দেওয়া চিহ্ন।"

মা মারা যাওয়ার সাত দিনের মধ্যে হাওয়া-বাতাসে ফালা-ফালা হয়ে গেল মাথার চাল। সাত দিন পুরলে খড়ের আঁটি বগলে বেঁধে ছোটমোট একটা পুঁটুলি নিয়ে আগড় ডিঙিয়ে ছেলে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কতক পথ চলে মিলল ক্ষীরের আড়ত। খড়ের আঁটি সাজিয়ে বসল সে দোকানের সামনে।

দিন গেল দুপুর গেল বিকেল গেল, গেল গোটা দিনটা পরদিনটা। তিন দিনের দিন সাঁঝের মুখে ব্যাপারি বেরিয়ে এল, দোকান থেকে। "কতয় বেচবে তোমার খড় ?"

তিন আঁটি খড় নিয়ে তাকে তিন শো ক্ষীর দিল ব্যাপারি। ছেলে চলল পুঁটুলিতে ক্ষীর বেঁধে।

কতক পথ চলে এক কাঁসারির দোকান। ছেলে বসল কাঁসাই দোকানের মুখে তার ক্ষীরের পুঁটুলি খুলে।

দিন গেল দুপুর গেল, গোটা দিন গেল, পরদিনটাও। তিন দিনের দিন সাঁঝের মুখে কাঁসারি বেরিয়ে এল দোকান থেকে। "কতয় বেচবে তোমার ক্ষীর ?"

"পয়সা দিলে বেচব না বাপু। যদি দাও তোমার ঐ একটা ফুলকাটা ফেরোঘটি, তাহলে বেচব ক্ষীর।"

"দোকোয়িশো! তাই সই। নাও যেটা পছন্দ।"

"তাহলে দাও তোমার ঐ কানা-ভাঙা পেট-তোবড়ানো ঘটিটা—"

এগিয়ে দিল কাঁসারি। ছেলে চলল ঘটির পেটে গানের তাল বাজাতে বাজাতে।

কতক পথ চলে মিলল এক কামারশাল। পুঁটুলির তেনা দিয়ে তোবড়া ঘটিটাকে তক-তকে করে মুছে ছেলে বসল কামারশালের মুখে ঘটি সাজিয়ে।

একদিন দু'দিন তিনদিনের দিন সাঁঝের মুখে উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এল কামার। "কতয় বেচবে গো তোমার ঘটি ?"

"পয়সায় বেচি নে বাপু।"

"তা হলে ?"

"যদি দাও তোমার একখানা ঐ তরোয়াল।"

"নাও কোনটা নেবে ?"

"ঐ যে জগুজাবড়া মাটিমাখা তরোয়াল-খানা, পড়ে আছে পেছনে—".

"বেশ, তাই নাও।"

সাতপুরনো তরোয়ালখানা দোলাতে দোলাতে চলল ছেলে এগিয়ে। দু ধারে ধানের খেত আর আখের খেত। গড়িয়ে নামতে লাগল পথ। ফুরিয়ে গেল এসে সমুদ্রের পাড়ে। বালির পরে বালির ঢেউ, তার কিনারায় বাতাস-ঝিরি দেওয়া অগাধ আকাশভাঙা জলের ঢল। ক্লান্তিতে গা-টা যেন আপনি গড়িয়ে পড়ল নরম বালির বিছানাতে। শুয়ে শুয়ে ছেলে দেখে আকাশ আর সাগর একাকার হয়ে গেছে মুখের ওপর। পাড়ের খুব কাছে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝকমকে চীনে জাহাজ। গালা-রঙের ড্রাগন-আঁকা পাল—এক একবার দমভর ফুঁ দিচ্ছে আকাশ, না কি সাগর—আর ফুলে ফুলে উঠছে পালটা। দেখতে দেখতে চোখ দুটো ঘুমে আঁধার হয়ে এল ছেলের।

এদিকে হয়েছে কি, এক চোর যাচ্ছিল পথে পথে। ছোট ছেলেটাকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে ভাবল, নিয়ে যাই তরোয়ালটা তুলে।

পা টিপে টিপে এসে, তারপর যেই নিতে যাবে তরোয়ালটা—কোথায় তরোয়াল? হিলহিল করে উঠল একটা সাপ। হাত সরিয়ে নিতেই কী ভুল কী ভুল—কোথায়' কী? ঢ্যাঙা পুরনো একটা তরোয়াল! হোক গে পুরনো—ভার আছে, লোহা আছে অনেকটা। যেই নিতে যাবে তুলে—হাতটা বাড়িয়েছে—হিলহিল করে উঠল বিষকালা সাপটা! চমকে সরিয়ে নিল হাতটা।

একবার দু'বার যত বার হাতটা সরিয়ে নেয়, দেখে কী ভুল চোখের—পুরনো ঢ্যাঙা-তরোয়ালটা পড়ে আছে ঘুমন্ত একটা ছোট

ছেলের পাশে, হাত দিতে গেছে কি হিলহিল করে উঠল হাব্দ সাপ।

মনের আশা মনে চেপে চোর উঠল ফিরে নিজের রাস্তায়। আর দূরের থেকে পুরো ব্যাপারটা বসে বসে দেখলেন চীন-জাহাজের কাপ্তেন। তাজ্জব ব্যাপার! এ কি আর দেখেই ছেড়ে দেওয়া যায়! নেমেই আসতে হল জাহাজ থেকে।

"ও খোকা, ও খোকা—"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ছেলে।

"অঠাঁই অবেলায় কেমনধারা ঘুম তোমার?"

চোখ রগড়ে দাঁড়িয়ে উঠল ছেলে।

"অচিন বিভুঁই দেশ, কেউ ঘুমোয় এমনি করে?"

ছেলে চাইল কাপ্তেনের মুখের দিকে।

"বেচবে নাকি তোমার ঐ তরোয়ালটা?"

"বেচব তো বটে, কিন্তু অনেক যে দাম।"

"কত দাম তোমার? জানো তো ঐ জাহাজটা আমার। জানো তো এক-একটা চীনে জাহাজে থাকে সাত রাজার জহরত। কত টাকা চাও?"

"না না, পয়সা দিয়ে বেচব না বাপু।"

"তবে?"

"যদি দাও জাহাজের ঐ একটা সুন্দর ছবি-আঁকা পর্দা—"

"বেশ তো, নাও যেটা ইচ্ছে তোমার।"

"দাও ঐ রঙচটা পর্দাটাই।"

গুটিয়ে মুড়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হল পর্দা।

পর্দা বগলে চেপে এবার ছেলে চলল সড়ক সড়ক-সোজা রাজার পুরী, কানাশি রাজার পুরী। তিনদিন তেরাত্তির অবিশ্রান্ত হেঁটে, অবশেষে ভরদুপুরবেলায় রাজবাড়ির ভেতর-বাগানের এক কোনা দিয়ে পর্দাটা টাঙিয়ে তার ছায়াটুকুতে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল গা এলিয়ে। গাছপালার রঙ ধরা অবশ দুপুর-রোদ্দুর—ঘুমে চোখ দুটো আঁধার হয়ে এল দেখতে দেখতে।

এদিকে, ওপরতলার খোলা ছাদের ওপর নিপুণ হয়ে নিজের হাতে গড়া বনসাইয়ের পরিচর্যা করতে করতে হঠাৎ রাজার নজরে পড়ল—নীচে সেপাইসাবুদ সবার চোখ এড়িয়ে না-জানা একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়েছে একেবারে ভেতর-বাগানে—ভাবনা নেই চিন্তা নেই, ঘুমোচ্ছে পড়ে পড়ে—শিয়রে আবার টাঙিয়ে রেখেছে রংচঙে পট-আঁকা পর্দা। দেখতে দেখতে ছবির পাখিগুলো শিস দিতে শুরু করল গানের সুরে—দেখতে দেখতে ছবির ওপর থেকে উড়ে এল তারা ডানা ছড়িয়ে—ছবি-আঁকা ফুলগুলোর গুছি গুছি পাপড়ি ছড়িয়ে দিতে লাগল ঠোঁটে কেটে।

দ্রুত পায়ে তরতর করে নেমে এলেন রাজা। কাছে আসতেই পর্দা-জোড়া শুধু রঙচঙা একটা ছবি—পাখি আর ফুলন্ত ডালপালার। নির্বাক, জ্বলজ্বল করছে অব্যক্ত গানে আর কথায়। রাজা ঠেলা দিলেন ঘুমন্ত ছেলেটার গায়ে।

ধড়মড় করে উঠে বসল ছেলে, "মহারাজ!"

"বেচবে তোমার এই পর্দা?"

"না মহারাজ, পয়সায় বেচব না।"

"কিসে বেচবে, তবে?"

"দিতে পারবেন মহারাজ?"

রাজা চাইলেন ছেলের চোখে চোখ রেখে।

"দুটি মাত্র জিনিস আপনার, যদি দেন—"

"বলো বলো কী জিনিস দিতে হবে? এই পর্দা আমার চাই।"

"যদি দেন দেশের যত জল আর জলের যত ঢেউ—"

"তার মানে?" পাগল নাকি ছেলেটা।

ছেলে বলল, "যদি দেন ডাঙার সব জল আর সাগরজোড়া জল আমায় লিখে, তবেই দেব পর্দাখানা।"

রাজা ভাবলেন এক দণ্ড। "বেশ, দিলাম তোমায় স্বত্ব করে।"

তখনই রাজার লোক এসে পাট্টা লিখে দিয়ে গেল ঘন সুমি কালির আখরে, ডিগডিগ ঢ্যাঁড়া পড়ে গেল হাটবাজারে—"মালিকানা বদল হয়েছে জলের।"

"লোকজন কই আমার মহারাজ!" ছেলে আর্জি করল, "কে দেখবে আমার স্বত্ব?"

"বেশ, তাও দিলুম।"

দু-একদিনের মধ্যেই রীতিমত নড়াচড়া পড়ে গেল রাজ্য জুড়ে। হল কী দেশে? দিঘির জল তুলতে গেলেই চেপে ধরে এসে

ফক্কুড়ি

সরল দে

দশখানা তার মুণ্ডু নড়ে,
চোখ কুড়িটা জ্বলে।
'ফক্কুড়িটা করছে কে রে ?'
আকাশ দেখে বলে।
একটু আগে মেঘ ছিল, আর
এখন ফাঁকা ফাঁকা,
হঠাৎ দেখা যায় সেখানে
রামধনু এক বাঁকা।
ফক্কুড়ি না ভয় দেখানো ?
আস্পর্ধা বটে !
তেমন তেমন শিক্ষা দেবে
এমন যদি ঘটে।
অসম্মানের নেই বাকি, তাই
দন্ত কিড়িমিড়ি।
পাড়বে ওটা ? তৈরি আছে
আকাশছোঁয়া সিঁড়ি !
যায় না দেখা দৃশ্য অমন,
এককুড়ি চোখ বুজে
রাবণরাজা ঢুলতে থাকে
দশখানা ঘাড় গুঁজে ॥

ছবি দেবাশিস দেব

পেয়াদা—"পয়সা দাও টাকা দাও।" সাগরের জল আনতে গেলেই চেপে ধরে এসে পেয়াদা—"পয়সা দাও, টাকা দাও।"

জল বলে পদার্থ, একদণ্ড চলে না যা নইলে, তাই নিতে কিনা লহরে লহরে খাজনা ? দল বেঁধে চলল সব রাজার কাছে দরবার করতে, "ধনেপ্রাণে মারা গেলুম মহারাজ, রক্ষে করুন—"

"সত্যিই তো! এ তো ভারী বিপত্তি।"

রাজা ডাকলেন ছেলেকে, "এ কী জুলুম তোমার বাপু! লোকে কি রাজ্য-ছাড়া হবে না কি তোমার জন্যে ?"

"কেন মহারাজ ?"

"কত টাকা চাই তোমার বলো. মালিকানা ফিরিয়ে দাও জলের।"

"সে কী করে হয় মহারাজ ?"

"এতগুলো লোককে মারতে চাও নাকি তুমি ?"

"জল আমার কেনা। দাম না পেলে দি কী করে মহারাজ ?"

"এমনিতেও দেবে না, টাকা দিলেও দেবে না—তা হলে দেখছি লড়তে হয় তোমার সঙ্গে !"

"সেই ভাল মহারাজ। লড়াই-ই হোক। জিততে পারলে এমনিতেই ফিরিয়ে দেব আপনার লেখাপড়া যা আছে, সব! কিন্তু, তার আগে একটা কথার জবাব চাই মহারাজ!"

"বলো, আবার কী কথা।"

"মিস্তিরিদের কাজের তার কেটে গিয়েছে বলে কে আমার মাকে রাতারাতি দিয়েছিল রাজ্যপার করে ?"

চকিতে রাজার চোখে পড়ল মুখের আদল ছেলেটার। ছাঁত করে উঠল বুকটা! সেই তো ...নিমেষে মনে পড়ে গেল—সব।

বললেন, "জল তোমারই থাক বাপু, আমার চাই নে। তুমি শুধু জলটা নিতে দাও ওদের... পয়সাকড়ি নিও না বাপু, গরিব মানুষ সব—অত পয়সা কোত্থেকে দেবে ? আর, আর তোমারই তো লোকজন ওরা সব।"

ছেলে চাইল রাজার মুখে, "তার মানে ?"

ফুলচন্দনের অভিষেক করে ছেলেকে রাজপাটে বসিয়ে রাজা হলেন সন্ন্যাসী বনবাসী। ছেলে হল রাজ্যের নতুন রাজা।

ছবি অলোক ধর

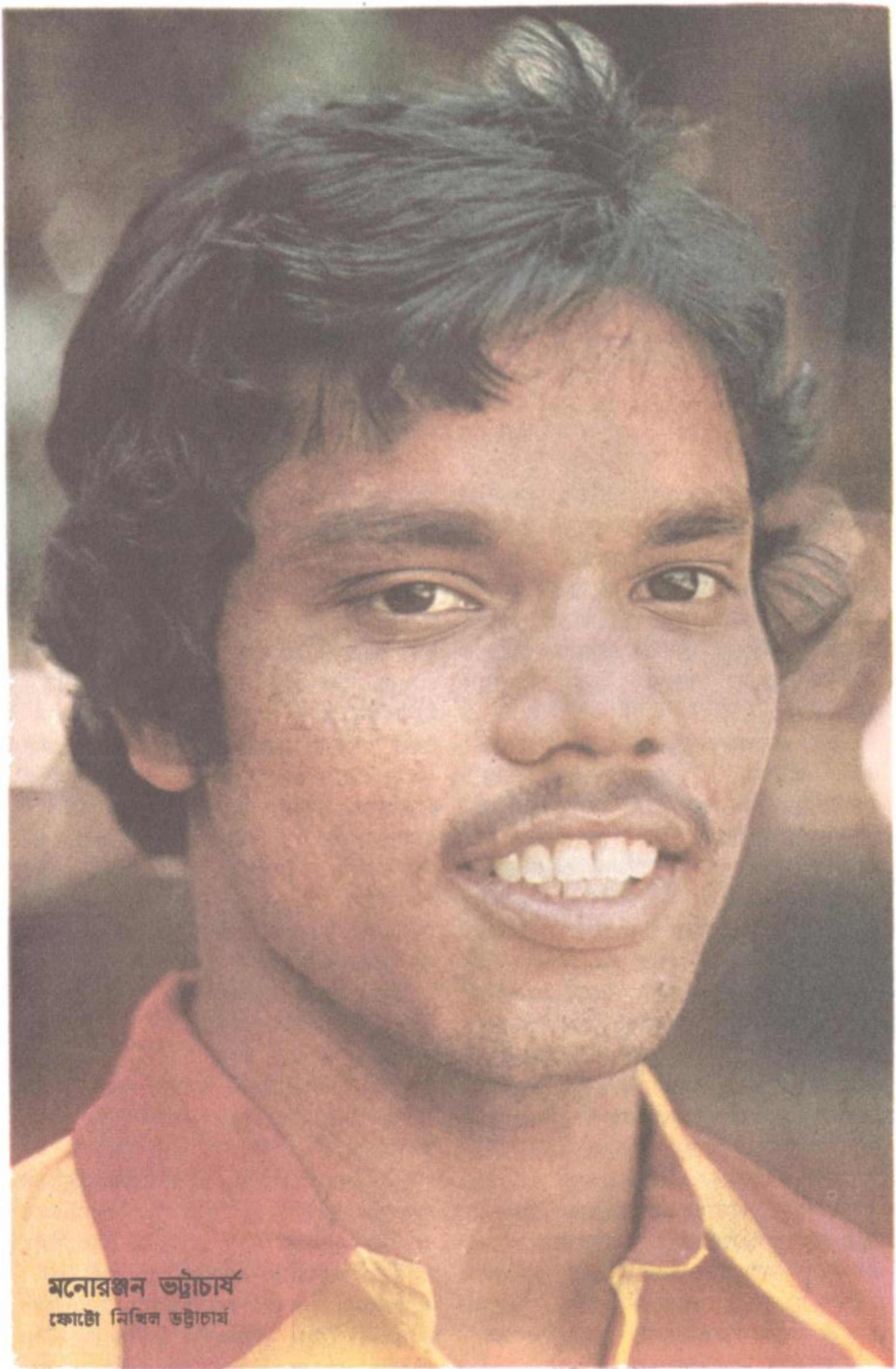

(পাতা ওলটালেই মনোরঞ্জনের খবর)

ইস্টবেঙ্গলের শক্ত ঘাঁটি

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের এক সকালের কথা। কলকাতা ফুটবলের বড় তিন ক্লাবের অনুশীলনী সবে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক তাঁবুর সামনেই কৌতূহলী সমর্থকেরা জটলা করছেন। খুব কাছ থেকে খেলোয়াড়দের দেখা হচ্ছে। আবার "এ-মরসুম কেমন যাবে" জাতীয় গভীর গবেষণাও চলছে। হঠাৎ ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর সামনের জনতার গুঞ্জন যেন জাদুমন্ত্রবলে একেবারে থেমে গেল। সেই নিস্তব্ধতায় বোধহয় একটা পিন পড়লেও শোনা যেত। অন্তত আশি-নব্বই জোড়া চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে কারণটা বুঝলাম ভারতের অন্যতম সেরা স্টপার ব্যাক আসছেন প্র্যাকটিসে।

হ্যাঁ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথাই বলছি। এবং তাঁকে ঐ সম্ভ্রম দেখানোর কারণ? সিঙ্গাপুরে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে প্রতিটি ম্যাচ খুব ভাল খেলেছিলেন বলেই কি?

না। ঠিক সেজন্যে নয়। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদয়ে মনোরঞ্জনের স্থান এত উঁচুতে হওয়ার একটিই কারণ—মনোরঞ্জন বিপদের দিনে ইস্টবেঙ্গলকে ছেড়ে যাননি। এ-বছর মাত্র দু দিনে আটজন খেলোয়াড়—সুরজিৎ, চিন্ময়, শ্যামল, প্রশান্ত, ডেভিড উইলিয়ামস, মিহির, সাব্বির ও ভাস্কর ক্লাব ছেড়ে চলে গেছেন। আর ঐ দিনেরই সকালের কাগজে খবর রয়েছে দেবরাজ, হরজিন্দার, গুরুদেব ও মনজিৎ ফিরবেন না। এই রকম সংকটে যে মনোরঞ্জনের মতো একজন খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গলের গড় রক্ষা করছেন সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে—এটা ঐ ক্লাবের সমর্থকদের সানন্দ বিস্ময়ের কথা বইকী।

কলকাতার মাঠে কিছু ভাগ্যবান খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা প্রথম ডিভিসন থেকেই ফুটবল শুরু করেন, মনোরঞ্জন তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯৭৪ সালে পুলিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের নীল-সাদা জার্সি পরেই মনোরঞ্জন প্রথম মাঠে নামেন। প্রথম ম্যাচ খেলেন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। পরের বছরও তিনি পুলিসেই খেলেন। ১৯৭৬-এ জর্জ টেলিগ্রাফে। তারপর থেকে ইস্টবেঙ্গলে।

গুণ থাকলে সুযোগ ঠিকই আসে। ১৯৭৫-এ বাংলার জুনিয়র দলে মনোরঞ্জন জায়গা করে নেন। সেবার বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরের বছর, যেবার শ্রীনগরে বাংলাকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে দেওয়া হল, সেবারও মনোরঞ্জন দলে ছিলেন। ঐ বছরই তিনি ভারতের জুনিয়র দলেও সুযোগ পান এবং পরের বছর অধিনায়ক হন। বাংলা দলের হয়ে প্রথম খেলেন কোয়াম্বাটুরে গত আন্তঃ-রাজ্য প্রতিযোগিতায়। ভারতীয় দলে খেলার প্রথম সুযোগ থেকে মনোরঞ্জন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হন। ভারতের যে দলটি গত অক্টোবরে পশ্চিম এশিয়া সফর করে, তাতে নাম থাকা সত্ত্বেও মনোরঞ্জন যেতে পারেননি। তাঁর নাকি পাসপোর্ট হারিয়ে যায় এ আই এফ এফ অফিস থেকে। মনোরঞ্জন নিজে এব্যাপারে কাউকে দোষারোপ করতে চান না, কিন্তু ঘটনাটি রহস্যময়। মনে হয়, এর পেছনে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল, যাদের পছন্দসই কাউকে মনোরঞ্জনের বদলে খেলানোর দরকার ছিল। "সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!"

যা-ই হোক, মনোরঞ্জনের মতো খেলোয়াড়ের পাসপোর্ট গন্ডগোল করে তাঁকে আটকে রাখা যায় একবারই। তাই ১৯৮০-র প্রাক-অলিম্পিকে তিনি সুযোগ পেলেন এবং দেখিয়ে দিলেন ভারতের পক্ষে তিনি কতটা অপরিহার্য।

সেই ছেলেবেলা থেকেই মনোরঞ্জন ফুটবল খেলছেন। বেলঘরিয়া যতীন দাশ বিদ্যামন্দিরে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলও চলে। তবে বাড়ির কড়াকড়ি এড়িয়ে খেলতে হত। মনোরঞ্জন অবশ্য পড়াশোনাকে অবহেলা করেননি। ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ থেকে বি এস-সি পাস করতে অসুবিধা হয়নি একটুও।

খেলাধুলোর ব্যাপারে মনোরঞ্জনকে উৎসাহ দিয়েছেন ও'র দাদা গঙ্গেশ ভট্টাচার্য। গঙ্গেশ-বাবু এবং বেলঘরিয়া মিলন সমিতির বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভলিবলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ময়দানে যাঁদের কাছে মনোরঞ্জন নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মণীশ সরকার, অরুণ ঘোষ, প্রদীপ ব্যানার্জি ও শান্ত মিত্র।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে লেখার মুশকিল হল সাদাসিধে, ও বিনয়ী স্বল্পবাক যুবকটি সাক্ষাৎকারের সময় একেবারেই মুখ খুলতে চান না। অন্তত নিজের বিষয় কিছুই বলতে চান না। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা কোনটি?"

উত্তর হল, "কোনোটিই নয়। কতদিনই বা ফুটবল খেলছি। যদি সেরকম কখনও খেলি, নিশ্চয়ই জানাব।"

বললাম, "আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন না? অন্তত যারা ফুটবল শিখছে, তাদের জন্যে?"

এবার উত্তর হল, "কী বলব? আমি নিজেই এখন খেলা শিখছি।"

এ-রকম ব্যক্তির সঙ্গে ট্যাকল করে পারা যায় না। যেমন বিপক্ষ ফরোয়ার্ডেরা মাঠে মনোরঞ্জনের সঙ্গে পারেন না—ট্যাকলিং, কিক, হেডিং, কভারিং—কোনো কিছুতেই। সর্বত্রই মনোরঞ্জন শক্ত ঘাঁটি। তিনি রাফ না টাফ, এ-তর্কে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু যে-কথাটা সম্পর্কে দ্বিমত নেই তা হল, তিনি দলে না থাকলে বিপক্ষ দলের ফরোয়ার্ডরা খুশি হবেন। তাদের চোখে মনোরঞ্জন "বাধার বিন্ধ্যাচল।"

মনোরঞ্জনের আদর্শ খেলোয়াড় হলেন সুধীরদা অর্থাৎ সুধীর কর্মকার।

"আর, বিদেশে?"

"বিদেশের কজনের খেলাই বা দেখেছি? তাই ও-সম্পর্কে কিছু বলা উচিত নয়।"

প্রসঙ্গত প্রি-অলিম্পিকের সম্পর্কে মনোরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলাম। মনোরঞ্জনের মতে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের কোনো তুলনাই হয় না। ওদের প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের, এখানকার মতো দেড় মাসের কোচিং ক্যাম্প নয়। আর দীর্ঘ দিন ওরা একের পর এক স্থানীয় শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলে

ফোটো তপন দাশ

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর অনেকদিন একসঙ্গে খেলায় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুন্দর পারস্পরিক বোঝাপড়া জন্মে যায়।

"প্রাক-অলিম্পিকে এশীয় অঞ্চলের সেরা দল কোনটি?"

"নিঃসন্দেহে ইরান। ওদের টীমই সবচেয়ে ব্যালান্সড টীম।"

ইরানের লেফট আউট (১১নং) সাইড ব্যাক হাবিবি (৩নং) ও একজন স্টপারের খেলা (৪নং) মনোরঞ্জনের ভাল লেগেছে।

মনোরঞ্জনকে যখন তাঁর নিজের বিষয় বেশি কিছু বলার জন্যে নিষ্ফলভাবে চাপ দিচ্ছিলাম, পিছন থেকে কোচ পি কে ব্যানার্জি বললেন, "ওকে নিয়ে লেখার সময় এখনো আসেনি। ওকে অ-নে-ক দূর যেতে হবে, এখানেই শেষ নয়। এবার প্রাক-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ও অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ছিল, এরপর যখন ১৯৮২-তে নিজের দেশে এশিয়ান গেমস হবে, তখন ওকে সকলের সেরা হতে হবে।"

সত্যি কথা। তাই বেলঘরিয়ার ডি এন চ্যাটার্জি স্ট্রীটের শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের ছেলে মনা আজ শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নয়, ভারতীয় দলেরও ভরসা। এই বয়সে (জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) মনোরঞ্জন যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে উনি আরও অনেক ওপরে উঠবেন। উঠতেই হবে।

ছোটদের যত সেরা বই

বিমল কর কয়েকখানি আশ্চর্য বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। তার মধ্যে 'ওআন্ডার মামা' হল তুমুল হাসির। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার বিচিত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মজাদার বর্ণনা। 'কাপালিকরা এখনও আছে' অথবা 'রাজবাড়ির ছোরা'য় গা-ছমছম অ্যাডভেনচার ও রহস্য-কাহিনী। এ-যুগের এক কাপালিকের যাবতীয় চালাকি কীভাবে ধরে ফেললো কিকিরা নামে এক ম্যাজিসিয়ান আর সেই কিকিরাই রাজবাড়ি থেকে হারানো এক মন্ত্রপূত ছোরার রহস্য কীভাবে ভেদ করলেন, তাই নিয়ে এই দুটি বই। আরেকটি বই 'হারানো জীপের রহস্য'—'রাজবাড়ির ছোরা'র সঙ্গে এক মলাটে বেরিয়েছে—এক দারুণ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী।

গিরিধারী কুণ্ডু দুটি চমৎকার বই লিখেছেন তোমাদের জন্য। একটির নাম 'টংসা চু'। ভুটানের নদী টুংসা, আদর করে সবাই ডাকে টংসা। সেই নদীকে ঘিরে ছবির মতো দেশ ভুটানকে নিয়ে দারুণ-দারুণ সব গল্প এই বইতে। এই বইটি একটি পুরস্কারও পেয়েছে। আর একটি বইয়ের নাম—'রাত একটা।' এটি অবশ্য একেবারে অন্য স্বাদের রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী। এটির ঘটনা শুরু ট্রেন থেকেই, শেষ হয়েছে দার্জিলিঙে এসে। এক নিখোঁজ শিকারীর খোঁজ করতে গিয়ে কী বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল আবিষ্কৃত হল, তাই নিয়েই লেখা এই বইটি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজকুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১০ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃস্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাঁই-বাগানের ভূত ৮ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৪ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআন্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

তিন প্রধানের তিন প্রধান

অশোক দাশগুপ্ত

গত বছর দার্জিলিং গোল্ড কাপের সেমি-ফাইনালে সিকিম সিভিল সার্ভিসকে মোহন-বাগান কোনোরকমে টপকাল শ্যাম থাপার চমৎকার গোলে। ফাইনাল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে, যারা অন্য দিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে পরিষ্কার তিন গোলে। মোহনবাগান ক্যাম্প নির্ভয়. তবু কোথায় যেন একটু ফাঁক ছিল। ফাঁকটা কোথায় বোঝা গেল, যখন সেটা ভর্তি হয়ে গেল। ফাইনালের দিন সকালে হোটেল পলি-নিয়ায় গিয়ে দেখি, গায়ে অ্যাডিডাসের গেঞ্জি আর জ্যাকেট—তিনি ছাদে চলেছেন সকালের মিষ্টি রোদে প্লেয়ারদের নিয়ে মীটিং করার জন্য। তিনি পি কে ব্যানার্জি। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে মন বলল—হারতে পারে না, মোহনবাগান আজ কিছুতেই হারতে পারে না।

আজ থেকে দশ বছর আগেও কলকাতা ময়দানে কোচের কাজ ছিল অল্প. নামজাদা খেলোয়াড়রা বড় টীমগুলোকে টেনে নিয়ে যেতেন।

ষাট আর সত্তরের দশকের সন্ধিক্ষণে হাওয়া ঘুরল। একে-একে বড় ক্লাবগুলির হাল শক্ত হাতে ধরার জন্য এলেন অমল দত্ত, অরুণ ঘোষ আর পি কে ব্যানার্জির মতো নামী কোচেরা। এবারও তিন প্রধানের কোচ এই তিনজন।

এঁরা সকলেই বড় কোচ, কিন্তু একরকম নন। যে-কোনো দিন সকালে মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে গেলে দেখবে, অমল দত্ত প্র্যাকটিস করাচ্ছেন প্রায় নিঃশব্দে। কারো ভুল হলে মৃদু শাসন থাকতে পারে, কিন্তু উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। মাঝে-মাঝে অবশ্য মজার খেলা খেলেন অমল দত্ত। ছিয়াত্তরে একদিন ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিসে গিয়ে দেখি তিনি শুটিং প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। মাঝখানে স্বয়ং অমল দত্ত, ফরোয়ার্ডরা বৃত্তাকারে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, দূরত্ব প্রায় কুড়ি গজ। কোচ

প্রদীপ ব্যানার্জি

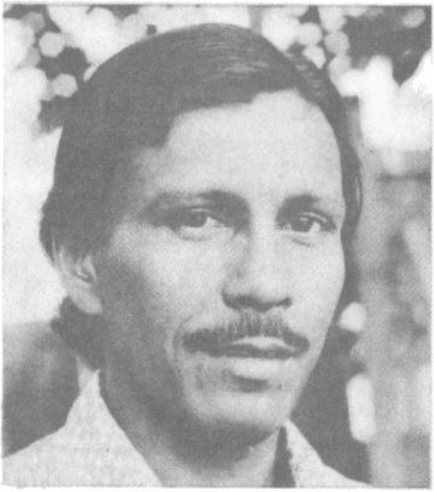

অরুণ ঘোষ

অমল দত্ত

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ—যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

কি ক'রে দেখুনঃ

* প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
* ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
* ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য,
জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 BN

বললেন, "প্রত্যেকে দুটো করে শট মারো। আমার গায়ে লাগাতে পারলেই এক টাকা পাবে।" না, সেদিন খুব বেশি টাকা খরচ হয়নি কোচের। তবে রঞ্জিত মুখার্জির একটি শট অমল দত্তকে প্রায় মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আঘাতটা সামলে নিয়ে বলেছিলেন, "গুড শট রঞ্জিত, এক টাকা জিতলে।"

মোহনবাগান মাঠে গিয়ে অরুণ ঘোষকে কি আরো ঠান্ডা মনে হল? টেন্টে এবং বাইরে তিনি সত্যিই শান্ত মানুষ। কিন্তু মাঠে নামলে ষাটের দশকের দুর্দান্ত স্টপারটি মাঝে মাঝে উঁকি দেন, অরুণ ঘোষ শাসন করেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে। আপাদমস্তক ভদ্রলোক অরুণ ঘোষ একটি ভুল সংশোধনের জন্য সারা সকাল কাটিয়ে দিতে পারেন। গত বছরের একটা ঘটনার কথা ভুলব না। ইস্টবেঙ্গলের আগের দু'তিনটি ম্যাচে চিন্ময় চ্যাটার্জি চমৎকারভাবে লাইন ধরে এগিয়েও ভাল সেন্টার করতে পারেননি। এক সকালে অরুণ ঘোষ চিন্ময়কে নিয়ে পড়লেন। দেখালেন, কোন জায়গায় ব্যাকসেন্টার রাখলে স্ট্রাইকার সহজে গোল পায়। তিন-চারটে সেন্টার সুরজিৎ সেনগুপ্তকে দিয়ে করিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক এইরকম।" চিন্ময় বেশ কয়েকবার নিখুঁত সেন্টার করতে পারলেন না। যথেচ্ছ বকলেন অরুণ ঘোষ। তারপর এল একটি দুর্দান্ত নিখুঁত সেন্টার, অবলীলায় সেই বল গোলে পাঠিয়ে অরুণ ঘোষ হাসলেন।

ইস্টবেঙ্গল মাঠের প্রধান মানুষটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রতি মুহূর্তে তুমি বুঝবে, তিনি দারুণভাবে আছেন। আড়াই ঘন্টা তিনি থাকেন ক্লান্তিহীন, একে ওয়েট ট্রেনিং করাচ্ছেন, ওকে খেলা বোঝাচ্ছেন—গোটা মাঠে একটা যুদ্ধের ভাব। এই যুদ্ধের আবহাওয়াই পছন্দ করেন ময়দানের সফলতম কোচ পি কে ব্যানার্জি। এই মানুষটির আসল ব্যাপার হল আত্মবিশ্বাস, কান পাতলেই বুঝবে, কী সহজভাবে এই আত্মবিশ্বাস তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

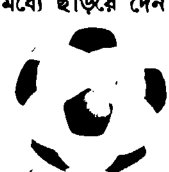

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

হকির হাল

চিরঞ্জীব

মাত্র একটি মাস—জুন। তারপর জুলাইয়ের উনিশ তারিখে অলিম্পিক শুরু। অলিম্পিকে এবার কি কোনো খেলায় ভারত সোনা জিতবে? দু-চার মাস আগেও আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম—না, কোনো খেলাতেই ভারত সোনা পাবে না। বিভিন্ন খেলার মান দেখে অধিকাংশ জনের এই ধারণাটা হয়েছিল। এপ্রিলের শুরুর দিকে এক রুশ ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ ভারতে এসে বলে গেলেন, হকিতে এবার ভারত সোনা জিতবেই। ওই বিশেষজ্ঞের কথা শুনে অনেকের মনে হয়েছিল—ও'র কথাগুলো হয়তো ফলতেও পারে। কিন্তু এক সপ্তাহ না কাটতেই বোঝা গেল, রুশ বিশেষজ্ঞের ধারণা ঠিক নয়।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে তিনদিনের একটি মিনি আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার ফল থেকে বোঝা গেল, পাকিস্তানের ধারে-কাছে যাওয়ার শক্তি ভারতীয় দলের নেই। চার দেশের এই প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া আর উদ্যোক্তা মালয়েশিয়া অংশ নিয়েছিল। লীগ প্রথার এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে ভারত ১—৩ গোলে হারে পাকিস্তানের কাছে। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত ৩—২ গোলে জিতলেও মালয়েশিয়া ভীষণ রকমের বেগ দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে ভি ভাস্করণের পেনাল্টি করনারে ভারত জিততে পেরেছিল। আন্তর্জাতিক হকিতে মালয়েশিয়ার স্থান এমনকিছু নয়—তবুও এককালের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে তারা কোণঠাসা করছে। শেষ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও ভারত তেমন ভাল খেলেনি। ফল হয় ১—১।

চার দেশের এই খেলায় ভারত হয়েছে তৃতীয়। আর বিশ্বশ্রেষ্ঠ পাকিস্তান? তারা তিনটি ম্যাচেই জিতেছে। ভারতকে হারিয়েছে ৩—১, অস্ট্রেলিয়াকে ৩—১ এবং মালয়েশিয়াকে ৫—১ গোলে। মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তো তারা নামিয়েছিল বেশিরভাগ রিজার্ভ প্লেয়ার।

ভারতের ফল হতাশার হলেও একটি ভারতীয় তরুণ কিন্তু আন্তর্জাতিক হকি কর্তা-

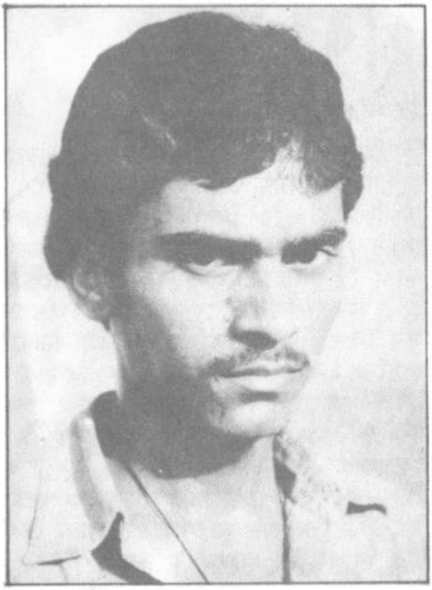

মহম্মদ শাহিদ

দের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন। তিনি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কুড়ি বছর বয়সী মহম্মদ শাহিদ। ইনসাইড-লেফট পজিশনের শাহিদ এই প্রতিযোগিতায় 'সেরা খেলোয়াড়' নির্বাচিত হয়েছেন খেলার গুণে এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে সু-আচরণের জন্য। শাহিদ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি গোল করেন, মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য ছাড়া ভারত জিততেই পারত না।

মালয়েশিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে যে কমিটি তৈরি করেন তাদেরই নির্বাচনে শাহিদ 'শ্রেষ্ঠ' হয়েছেন। ভারতের বড়দের দলের হয়ে তাঁর এটি দ্বিতীয় খেলা। তিনি বড়দের দলে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন গত জানুয়ারিতে করাচির চ্যাম্পিয়ান হকি প্রতিযোগিতায়। তবে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়েছিলেন ১৯৭৯-এর সেপ্টেম্বরে প্যারিসের জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে।

মহম্মদ শাহিদের এই সম্মান আমাদের হকির পক্ষে মঙ্গলের। আজ আমাদের এইরকম ডজন খানেক খেলোয়াড় চাই। দরকার এঁদের আরও ভাল প্রশিক্ষণের, প্রয়োজন দরকারি সবরকম সরঞ্জাম-সরবরাহের। আজকাল অধিকাংশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে অ্যাস্ট্রো টার্ফের উপর। ভারতের কোথাও কিন্তু অ্যাস্ট্রো টার্ফের ব্যবস্থা নেই। পাকিস্তান এ-ব্যাপারে অনেক এগিয়ে। আমাদের চাইতে 'ছোট' দেশ হলেও খেলাধুলো—বিশেষ করে ক্রিকেটের মতো হকির অনুশীলন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ওদের কোনোরকম কার্পণ্য নেই। আমাদের হকি খেলোয়াড়রা যাতে পাকিস্তানে অবস্থান করে অ্যাস্ট্রো টার্ফের উপর অনুশীলন করতে পারেন, তার জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ভাবতেও কেমন লাগে!

হকিতে ভারত হারলে আমরা সকলেই সমালোচনা করি—সরকারও তাই করেন। কিন্তু একটা অ্যাস্ট্রো টার্ফ আনা বা কেনার বন্দোবস্ত কি সরকার করতে পারেন না?

কথা আছে আরও। এবার কুয়ালালামপুরে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও খেলোয়াড়রা জানতেন না—তাঁরা আদৌ এই প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবেন কিনা। খেলায় উন্নত বা পিছিয়ে থাকা প্রতিটি দেশে দেখি—জাতীয় দল বাইরে গেলে তাদের সব খরচ দেন সরকার অথবা জাতীয় সংস্থা। আমাদের এখানে তেমন নজির বোধহয় কম। এই হকি দলেও যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের যাওয়া আসা ইত্যাদির খরচ দিতে হয়েছে নিজ নিজ রাজ্য হকি সংস্থাকে। (অবশ্য অনেকে টাকার জোগাড় করতে পারেননি)। যাওয়ার দুদিন আগেও রিজার্ভ ব্যাংকে সরকারী নির্দেশও পৌঁছয়নি—'হকি খেলোয়াড়দের বিদেশী মুদ্রা দিন।' ফলে প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠায় সময় কাটান। বড় প্রতিযোগিতায় যাওয়ার আগে খেলে বা অনুশীলনের দ্বারা চোস্ত হওয়ার বদলে টাকার জোগাড়, পাসপোর্ট, ভিসা সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য প্রতিবারই এঁদের ভুগতে হয়। এতে কিন্তু খেলার প্রতি দরদ কমে যায়। কমে মনোনিবেশও। এসব ঘটনাও খেলায় হারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভুল শুধরে নাও। প্রথম বছর ফেডারেশন কাপের ফাইনালে আই টি আই-র কাছে ০—১ গোলে মোহনবাগান হেরেছিল। ০—৪ গোলে নয়। ১ এপ্রিল তারিখের আনন্দমেলায় 'ফেডারেশন-কাপ' শীর্ষক লেখায় ভুল তথ্য বেরিয়েছিল। এবার শুধরে নাও।

সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ

মুকুল দত্ত

ডাকনাম ছিল বোকা। আসলে ছিলেন পোকা, জলের পোকা। ডাঙার চাইতে জলে বেশি সময় কাটাতেন। আমি সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের কথা বলছি। সম্প্রতি তিনি ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

অ্যামেচার সাঁতার থেকে সরে না গেলে দক্ষ সাঁতারু প্রফুল্লবাবু ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে যেতে পারতেন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, চারজন বাঙালী সাঁতারু—মিহির সেন, আরতি সাহা (এখন আরতি গুপ্ত), ডাঃ বিমল চন্দ্র ও নীতিন রায় ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে দারুণ নাম করেছেন। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন বাংলা দেশের সাঁতারু ব্রজেন দাসও। কিন্তু এঁদের অনেক আগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রফুল্ল ঘোষই হয়ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে পারতেন, যদি না অর্থাভাবে তাঁর উদ্যোগ ভন্ডুল হত। অর্থাভাবও অবশ্য সঠিক কারণ নয়। কেননা, ১৯৩৮ সালে প্রফুল্লবাবু একখানি মোটরগাড়ি কিনে তার গায়ে "প্রফুল্ল ঘোষ অন ওয়ে টু ক্রস ইংলিশ চ্যানেল উইথ বাণী ঘোষ'' লিখে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার ফলে ইংল্যান্ড যাবার পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটারপোলো, জিমনাসটিকস, অ্যাথলেটিকস, সার্কাস, ফায়ার-ডাইভিং ইত্যাদি নানারকমের খেলাধুলোয় নাম কিনলেও প্রফুল্ল ঘোষ সব চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এন্ডিওরেন্স সাঁতারে। অবিরাম সাঁতার কাটা, কিংবা একটানা বহু ঘন্টা জলে ভেসে থাকার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রফুল্লবাবু।

এন্ডিওরেন্স সাঁতার অলিম্পিক-স্বীকৃত ইভেন্ট নয়। কিন্তু সহনশীলতা, শারীরিক শক্তি এবং দক্ষতার বিচারে এ-সাঁতারের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশে প্রথম এন্ডিওরেন্স সাঁতারে নামেন মহম্মদ সফি। ১৯২৮ সালে কলকাতার

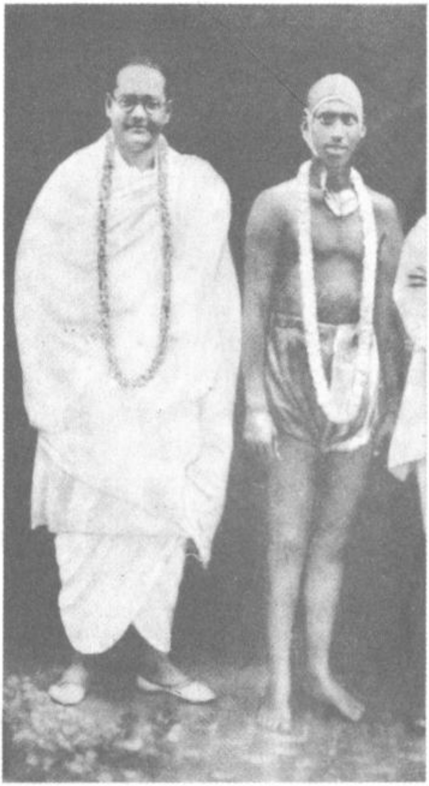

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ

ওয়েলেসলি স্কোয়ারে সফি অবিরাম ২৪ ঘন্টা সাঁতার কাটেন। হায়দরাবাদের নিজাম খুশি হয়ে সফিকে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেন। নিজামের কাছ থেকে আরও টাকা পেয়ে সফি পড়াশুনা করতে যান ইংল্যান্ডে।

সফির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রফুল্ল ঘোষ প্রথম অবিরাম সাঁতারে নামেন হেদোয়, এখন যার নাম আজাদ হিন্দ বাগ। সেটা ১৯২৯ সালের কথা। প্রফুল্ল ঘোষের বয়সও তখন ২৯। প্রফুল্লবাবু প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফির রেকর্ড ভেঙে দেন ২৭৮ বার হেদো এপার-ওপার করে এবং ২৮ ঘন্টা জলে কাটিয়ে। তখনও তিনি বহাল তবিয়তে ছিলেন। কিন্তু তখনকার পুলিস-কমিশনার চার্লস টেগার্টের নির্দেশে তাঁকে একরকম জোর করেই জল থেকে তুলে দেওয়া হয়। কারণ, প্রফুল্ল ঘোষের সাঁতার দেখতে অসম্ভব ভিড় হওয়ায় রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ার উপক্রম

হয়েছিল। রাতারাতি প্রফুল্ল ঘোষের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠানের শেষে প্রফুল্লবাবু হেদোয় নামলেন নতুন বিশ্বরেকর্ড করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তখন খবর ছিল, অবিরাম সাঁতারে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার রিসোর বিশ্ব-রেকর্ড ৬২ ঘন্টা ২ মিনিট। সে রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ জলে ছিলেন ৬৭ ঘন্টা ১০ মিনিট। সারা শহরে তখন দারুণ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কলকাতা কর্পোরেশন তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানিয়ে হীরের আংটি উপহার দেয়।

কিছুকাল পরে খবর এল, যুক্তরাষ্ট্রের একটি মেয়ে, নাম লোটি মুর, ৭২ ঘন্টা ২ মিনিট জলে কাটিয়ে অবিরাম সাঁতারে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। জেদি সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ সে রেকর্ডও ভাঙলেন ৭২ ঘন্টা ১৮ মিনিট হেদোয় কাটিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অবশ্য জল থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি একত্রিশ সালের কথা।

রেঙ্গুনের রয়্যাল লেকে ৭৯ ঘন্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটার পর বর্মা মুলুককে প্রফুল্ল ঘোষকে নিয়ে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। রেঙ্গুনে পৌরপ্রতিষ্ঠান তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়।

১৯৩৪ সালে ঢাকার জগন্নাথ হলের পুকুরে হাতে শেকল বেঁধে প্রফুল্লবাবু সাঁতার কাটলেন ৫৪ ঘন্টা। দু' বছর পরে, ছত্রিশ সালে, আবার হেদোয় শেকল-বাঁধা অবস্থায় কাটালেন ৭২ ঘন্টা ১৮ মিনিট।

দারুণ ডানপিটে মানুষ ছিলেন প্রফুল্ল-বাবু। সার্কাসে কীভাবে ফায়ার-ডাইভিং করতেন জানো? গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে ৭০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তেন নীচের চৌবাচ্চায়। এই খেলা দেখাবার জন্যে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া সার্কাস তাঁকে মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে দিত।

পরে অবশ্য প্রফুল্লবাবু ফায়ার-ডাইভিং ছেড়ে সাঁতারের জগতেই ফিরে আসেন। নিজের হাতে তৈরি করেছেন অনেক সাঁতারুকে। প্রফুল্ল ঘোষ রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, শরৎচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন।

দিল্লি আবার রণজি জিতল

অলোক দাশগুপ্ত

জুবিলী টেস্টে যে দলের একজনও খেলোয়াড় ভারতীয় একাদশে স্থান পাননি, সেই দিল্লি গাভাসকার, বেংসরকার, ঘাউড়ি প্রভৃতি নামীদামি ক্রিকেটার দিয়ে গড়া বোম্বাই-দলকে ২৪০ রানে হারিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা সম্মান রণজি ট্রফি দ্বিতীয় বছরের জন্য নিজেদের ঘরে রাখল।

গতবারের মতো এবারও দিল্লি ছিল টপ ফেভারিট। বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে কিছু 'প্রাক্তন' টেস্ট ক্রিকেটার এবং কিছু ভবিষ্যতের তারকাদের নিয়ে গড়া দিল্লি দল সত্যিকারের একটা ব্যালান্সড সাইড।

দিল্লির এবারের রণজি-জয়ে মহিন্দার অমরনাথ এবং কীর্তি আজাদের ভূমিকা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জিমি (এই নামেই মহিন্দার খেলোয়াড়-মহলে বেশি পরিচিত) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি গড়লেন ফাইনালে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। অনেকে আবার ১৯১ রানের এই অনবদ্য ইনিংসটিকে তাঁর ক্রীড়া-জীবনের সেরা ইনিংস বলেও বর্ণনা করেছেন কারণ দীর্ঘ সময় ধরে উইকেটে থেকে বোলারদের দ্বারা অযথা প্রলুব্ধ না হয়ে অত্যন্ত দায়িত্বশীলের মতো ব্যাট করেছেন মহিন্দার। দুর্ভাগ্য, মাত্র নয় রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরি পেলেন না।

মহিন্দার এবং তাঁর বড় ভাই সুরিন্দার যখন একসঙ্গে ব্যাট করছিলেন তখন দিল্লির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ১১০ রানের মধ্যে চৌহান, বেঙ্কট সুন্দরম এবং অরুণলাল প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন। দুই ভাই মিলে চতুর্থ উইকেটে ১৬৫ মূল্যবান রানই শুধু যোগ করেননি, দিল্লির বড় রানের ইনিংসের ভিত্ গড়ে দিয়ে গেছেন, যার ওপর ইমারত বানিয়েছেন মহিন্দার নিজে এবং কীর্তি আজাদ।

কীর্তিকে এ বছরের রণজির সেরা

খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দুই বছর আগেও দিল্লির সেণ্ট স্টিফেনস কলেজের ছাত্র এই ছেলেটি ক্রিকেট-মহলে তেমন পরিচিত ছিলেন না। বেদী, সুরিন্দর, মহিন্দার এবং চৌহান যখন ভারতীয় দলের হয়ে পাকিস্তান সফর করছিলেন, সেই সময়ে দিল্লি দলে স্থান পেয়ে আস্তে-আস্তে নিজের ঘরের আসন পাকাপোক্ত করে নেন কীর্তি। কোয়ার্টার ফাইনালে ইডেনে বাংলার বিরুদ্ধে ৬০ রানের অপরাজিত ইনিংসটি দিল্লিকে এক সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আর ফাইনালে তাঁর সেঞ্চুরি ফিরোজ শা কোটলার দর্শক অনেকদিন তাঁদের মনের মণিকোঠায় যত্ন করে রেখে দেবেন, ৮২ থেকে পরপর তিনটি ছয় হাঁকিয়ে ১০০ করেছিলেন কীর্তি আজাদ। এমন ব্যাটিং যেন কীর্তিকেই মানায়—তাঁর খেলায় কেতাবি ঢং নেই; কিন্তু বল মারেন অসম্ভব জোরে এবং বোলারদের পরোয়া না করে। কীর্তির বাড়তি সম্পদ তাঁর জোরের উপর অফ-স্পিন বোলিং, যাকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগিয়েছেন অধিনায়ক বেদী। বেদী নিজেও বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখিয়েছেন ব্যাটসম্যানদের প্রলুব্ধ করে দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বাইয়ের পাঁচ উইকেট দখল করে।

ফাইনালে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও আগের ম্যাচগুলিতে সফল হয়েছেন মদনলাল, অরুণলাল এবং সুনীল ভালসন। মদন একজন লড়িয়ে খেলোয়াড়, দলের প্রয়োজনে বলে-ব্যাটে দক্ষতা দেখিয়েছেন। ইডেনে অরুণলালের ৭৮ একটা স্মরণীয় ইনিংস। আর সুনীল ভালসনকে তো নির্দ্বিধায় ভারতের ভবিষ্যৎ ওপেনিং বোলার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এই তরুণটির বলের গতি বেশ ফাস্ট—কপিলদেবের মতো। দুই রকমের সুইং করতে পারেন। এ ছাড়া বাঁ-হাতি বোলারের স্বাভাবিক কোনাকুনি ডেলিভারি তো আছেই। তবে ভালসনের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র হল যে, বলগুলি কোনাকুনি এসে হঠাৎ ভিতরের দিকে সুইং করে ঢোকে।

একসময় ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সেদিন আর নেই।

ট্রফি হাতে মহিন্দার ও বেদী

কিন্তু এখনও বোম্বাইকে ভারতীয় ক্রিকেটের পীঠস্থান বলে মনে করা হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বিহার এবং সেমিফাইনালে হরিয়ানাকে মোটামুটি সহজে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেও বোম্বাই কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র অধিনায়ক গাভাসকার (৪৪ এবং ৯৩) এবং কিছুটা বেংসরকার (প্রথম ইনিংসে ৮১) ও রামনাথ পারকার (প্রথম ইনিংসে ৭৭) নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলেছেন। শিভালকার মাপা লাইন ও লেংথে বল করে গেছেন। আর আশা জাগিয়েছেন উঠতি বাঁ-হাতি স্পিনার রবি শাস্ত্রী—দ্বিতীয় ইনিংসে অল্প রানে দিল্লির ছয় জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে। বোম্বাইয়ের ম্যাচ জেতার ক্ষীণ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

বোম্বাইয়ের দুর্ভাগ্য, আহত থাকার জন্য সন্দীপ পাতিল ফাইনালে খেলতে পারেননি। অধিনায়ক গাভাসকার স্বীকার করেছেন, সন্দীপ থাকলে ম্যাচের ফলাফল হয়তো অন্যরকম হতে পারত।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
ঠক্! ঠক্!
দেখুন সবাই!
সরেস মালমশলা দিয়ে...
চমৎকার ভেজে তুলছি!
তার উপর সেরা ক্রীম
ফ্রী নমুনার জন্যে ভিতরে যান!
ঠক্! ঠক্!
দেখুন সবাই!
দোকান বন্ধ

সুন্দর সুন্দর সন্দেহ

কুন্তক

এ কি হাতের লেখা হয়েছে? না কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং করে রেখেছ কতগুলো?—এই বলে টুম্পির ইতিহাস খাতাটা সরিয়ে দিয়ে বৌদি আমায় বললেন : তোমার আশকারা পেয়ে এরা আরো গোল্লায় যাচ্ছে।

তা যাক। কিন্তু আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি কাক বা বকের ঠ্যাং ভাল করে দেখেছ?

এই শুরু হল তোমার বাজে কথা। রান্না পড়ে আছে, আমি চললাম।

নন্তু বলল : বেকায়দায় পড়ে মা কেমন পালাল, দেখলি তো টুম্পি।

টুম্পি জিজ্ঞেস করল : কিন্তু ও-কথাটা মাকে তুমি বললে কেন কাকু?

তোর মা একটু অলংকার করল কিনা, তাই বললাম। এই হল সাজিয়ে কথা বলার আরেক ধরন।

ও, সাজিয়ে কথা বলা! টুম্পি খেল বকুনি, আর কাকু দেখছেন সাজিয়ে বলা।

তা তো দেখবই। একেই বলে হংসের্যথা ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ। বাজে কথার মধ্য দিয়ে আসল কথাটা তুলে নেওয়া। 'সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর।'

এ আবার কার লাইন?

কার আর, রবীন্দ্রনাথের।

পারা যায় না আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কিন্তু, এখানে ক্ষীরটা কী?

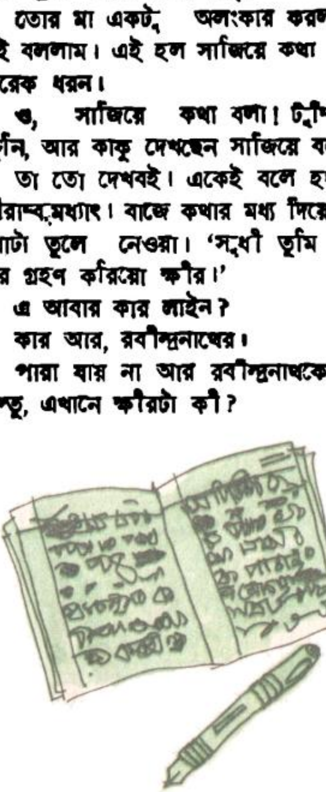

ক্ষীর হচ্ছে, 'কাকের ঠ্যাঙের মতো লেখা' না বলে এই-যে বলা হল 'এ কি লেখা, না কি কাকের ঠ্যাং', অমনি একটা নতুন অলংকার হয়ে গেল।

যাঃ! মতো-টা রইল না বলে?

মতো তো রইলই না, তার সঙ্গে মজা হল যে 'মতো'র আগেপরে যে-দুটো কথা, সেই দুটোতেই রইল একটা সন্দেহ।

সন্দেহ? ইস্‌ সন্দেহ! যার নাকি কোনো সন্দেহ আছে যে আমার হাতের লেখা বাজে। কিন্তু, কবিতাতেও এরকম হয় বুঝি?

হয় না? মনে নেই সত্যেন দত্তের 'দূরের পাল্লা'? ওই-যে 'কালো নদীর দুই কিনারে কল্পতরুর কুঞ্জ কি এ?' নদীর দুধারে বন দেখে মনে হচ্ছে যেন কল্পতরু-কুঞ্জ। 'এটার মতো ওটা' না বলে, বলা হল 'এটা? না ওটা?'

নন্তু জিজ্ঞেস করল : এ লাইনে ওটাকে তো দেখতে পাচ্ছি, এটা-টা কোথায়?

সেটা এখানে একটু লুকিয়ে আছে ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা তো একই হল? সেই মিলিয়ে বলাই তো? ধরনটা কেবল পালটে গেল একটু। ধর যদি বলি, মেয়েটি যেন ফুলের মতো ফুটে আছে, মেয়েটি চলছে যেন বীণার সুর বাজছে।

আবার বীণা?

থাম তুই। তো, এভাবেও তো বলা যায় কথাটা? আবার এভাবেও বলতে পারি 'চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি?/চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি?' আমি কি আমি, না চিরমন্দার? আমার চলা কি চলা, না বীণাঝংকার?

তোমার চলার কথাই যদি বলো তো সেটাকে ঢেঁকির ঢেঁকিটংকারও বলা যায়।

বড় ফাজিল হয়েছিস নন্তু।

টুম্পি হঠাৎ বলে উঠল : বুঝেছি, বুঝেছি। ওই-যে 'চিত্রাঙ্গদা'য় আছে

সে কি সত্য? সে কি মায়া?
সে কি কায়া?
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া?

এইসব সুন্দর সুন্দর সন্দেহের কথা বলছ তুমি, না?

(ক্রমশ)

তুমি পরীক্ষা নাও

প্রসাদ

আমাদের এই সহজে ইংরেজির ক্লাসে পরীক্ষা-টরিক্ষার বালাই বিশেষ থাকছে না, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু, ধরো, যদি চামেলিদের প্রতিবেশী অর্জুনের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ছোট-খাটো একটা পরীক্ষার মতোই নেওয়া যায়, তো কেমন হয়? ধরো, তুমিই পরীক্ষক, চম্বল আর চামেলি তোমার ছাত্র-ছাত্রী। মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে, তুমি প্রশ্ন করছ, ওরা ভাই-বোনে উত্তর দিচ্ছে।

You : How long was Arjun missing ?

Chambal : He was missing for almost two hours.

You : When did you first hear about it ?

Chambal : I first heard about it a little after eight in the evening.

You : What did you do then ?

Chambal : I went to Mr Singh's place as fast as I could.

You : Were there many others there ?

Chambal : Yes. As many as twenty to twentyfive people had got there.

You : What were they all doing ?

Chambal : They were doing as much as they could to find the boy.

এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রশ্নগুলো আমিই করে দিচ্ছিলাম। এবারে তিনটে প্রশ্ন তোমাকে নিজেকেই বানাতে হবে। চম্বলের উত্তরগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি :

You : . . . . ?

Chambal : It was impossible for the boy to go out because the front door was closed all the time.

You : . . . . ?

Chambal : Nobody had thought of this because all were excited and nervous.

You : . . . . ?

Chambal : I felt happy when the boy was found.

এবার চামেলির পালা :

You : Tell me what you thought when Arjun was missing, Chameli.

Chameli : I thought wicked people had stolen him.

You : Had they, actually ?

Chameli : No, but that's what I thought as soon as I heard Arjun was missing.

এরকম আরো অনেক প্রশ্ন তুমি করতে পারো। কে কত প্রশ্ন করতে পারো অর্জুনের হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে, করো তো দেখি?

তাছাড়া, এই বাক্যগুলোও লক্ষ করো :

(a) I went to Mr. Singh's place *as fast as* I could.

(b) *As many as* twenty people had got there.

(c) They were doing *as much as* they could to find the boy.

আর কোনো বাক্য ওপরে খুঁজে পাও কিনা দেখ তো, যাতে এই ধরনের কথা আছে।

বাঘা

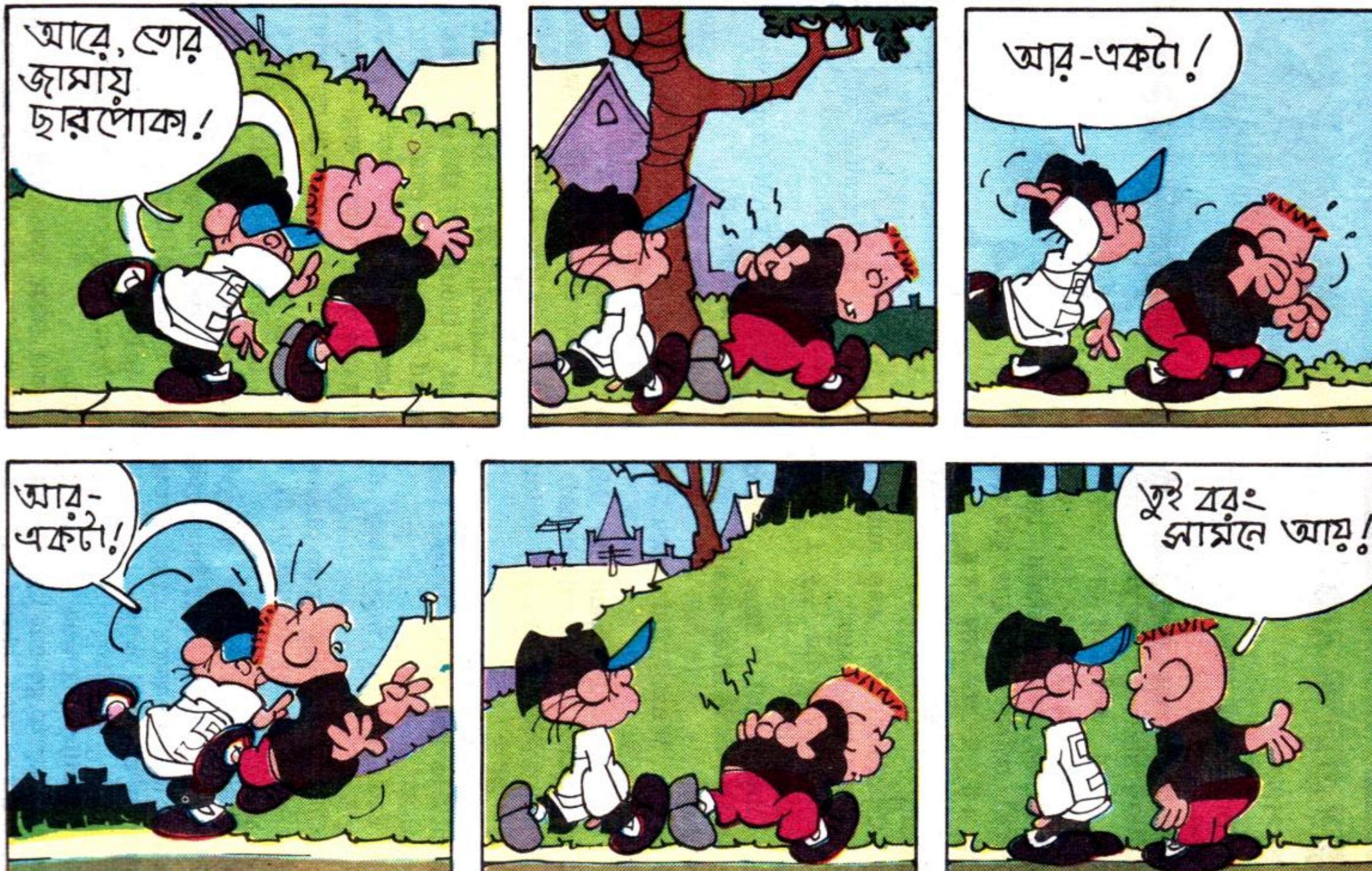

গাবলু
উপহার
ফল ফুল
মিষ্টি
তাড়াতাড়ি
সেরে ওঠো

জন্তু-জানোয়ার : গরু ৪

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌকো কাজের ওপর কালোর দু'এক আঁচড়েই কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে। তোমরাও চেষ্টা করো, আরও কতভাবে গরুকে ধরা যায়।

কাগজের খেলনা

কারিগর

গত বার তোমাদের ভাঁজ করে খেলনা তৈরির নমুনা দেখিয়েছি। এবার ঐ একই ভাবে আরও কিছু জন্তু-জানোয়ার করে দেখালুম। এবার নিজেরা চেষ্টা করে দেখ তো কত রকমের খেলনা তৈরি করা যায়।

জেনে রাখো—(১) জন্তু-জানোয়ার করার সময় তাদের আকারের ওপর নজর দেবে। (২) প্রয়োজন মতো রঙিন বোর্ড ব্যবহার করবে। খেলনার বাহারের জন্য পুঁতি আর রঙ-বেরঙের টুকরো কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিনটাস-PIL. SH. 2-1810 BG

Regd No WB|CC 264

ক্যাম্পা অরেঞ্জের* স্বাদের বাহার খেলে পরে ভোলা দায়, বড় মজাদার!

তৃষ্ণাহর ক্যাম্পা প্রাণে জাগায় উল্লাস। এখন অরেঞ্জের* মজাদার চমৎকার স্বাদে জাগিয়ে তুলুন আরও উচ্ছলতা। ক্যাম্পা খান, খাওয়ান। উল্লাসের রঙ, উল্লাসের স্বাদ—ক্যাম্পা অরেঞ্জের* স্বাদ। জীবনের অপূর্ণ তিয়াস ক্যাম্পা অরেঞ্জের* স্বাদে পূর্ণ করুন—এসব প্রাণোচ্ছল তৃষ্ণার্ত লোকেদের মত···এখনই!

* আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভর

Campa

ক্যাম্পা
অরেঞ্জ* স্বাদ

OBM 3063 BN